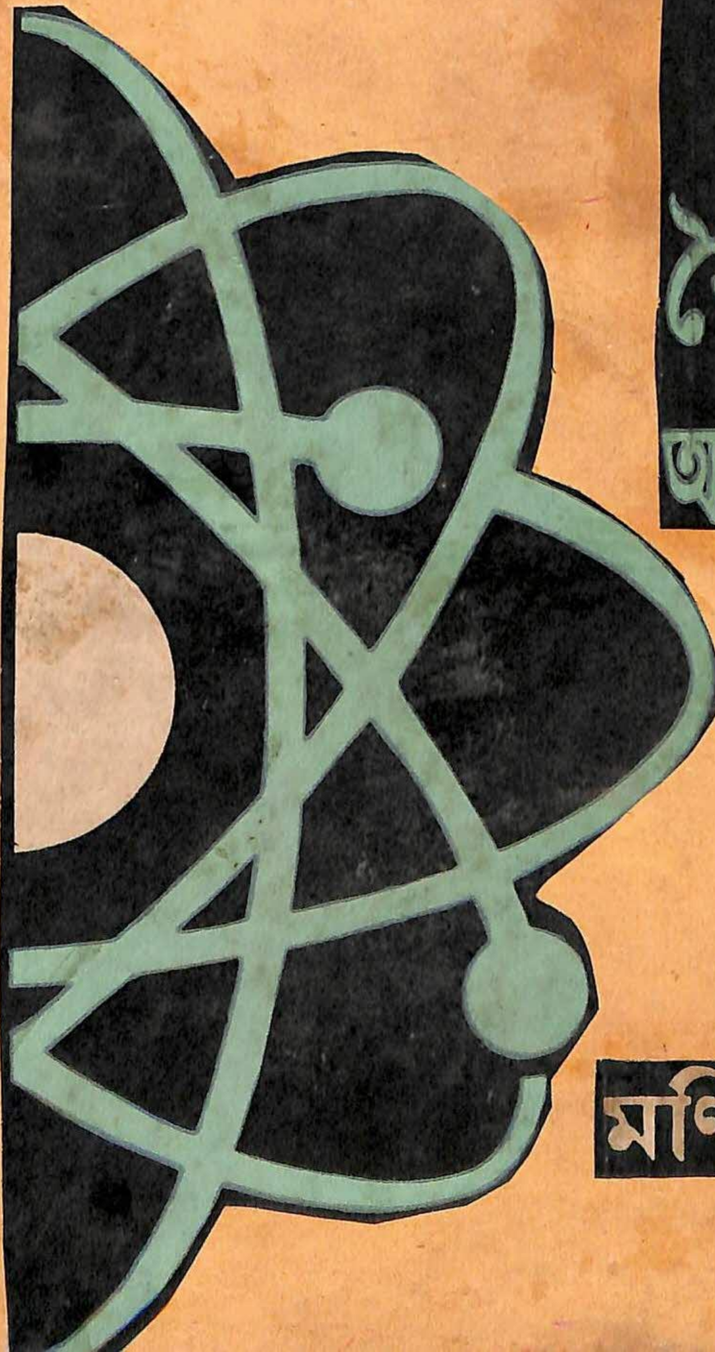
বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার



মণি বাগচি

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

মণি বাগচি

শৈব্যা • প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীরবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯

পঞ্চম মুদ্রণ : ১৯৮৯

মূল্য : ২০ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
পি-২৯, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য বই

আইনস্টাইন

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

সত্যেন্দ্রনাথ

পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ ভাবা

আর্কিমিডিস

(খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২)

'আমাকে একটা দাঁড়াবার জায়গা দিন, আমি সমস্ত পৃথিবীটাকে তুলতে পারব।'

এই কথা বলেছিলেন যিনি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাসে তিনিই আর্কিমিডিস নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজে আজো তাঁর নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীর লক্ষণ কি? তাঁর থাকবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা, যেটি পর্যবেক্ষণ করা হলো সেটি উপলব্ধি করার ক্ষমতা এবং অবশেষে তারই সহায়তায় নতুন নতুন সৃষ্টি উদ্ভাবন করা। আর্কিমিডিস স্নানাগারে ঢুকেছিলেন একদিন, কিছুক্ষণ বাদে সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নয়—অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব নিয়ে—'Specific gravity' বা আপেক্ষিক গুরুত্ব।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে মহাবীর আলেকজেণ্ডার আলেকজেণ্ড্রিয়া শহর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই স্থানটিতে গড়ে উঠল একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। যে সব শিক্ষক এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিশারদ ইউক্লিড। অল্পকাল পরে এখানে যোগ দিলেন সিরাকুজবাসী আর্কিমিডিস। আলেকজেণ্ড্রিয়ায় থাকাকালীন আর্কিমিডিস নানা রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে রত ছিলেন। চাষের ক্ষেতে জলসেচনের জন্য এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। স্ক্রু-আকারের একটা ফাঁপা নলের নিচের প্রান্ত জলের মধ্যে ডোবান, স্ক্রুটা ঘোরাতে থাকলে জল নিচে থেকে উপরে উঠবে।

আলেকজেণ্ড্রিয়ায় কয়েক বছর থাকার পর আর্কিমিডিস ফিরে

এলেন সিরাকুজে (এটি ছিল সিসিলির অন্তর্গত), এই সময়ে রাজা হীরো তাঁকে সামরিক এঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত করলেন। এই সময়েই একদিন রাজা হীরো তাঁর মাথার মুকুটটি খাঁটি সোনার কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দিলেন আর্কিমিডিসের উপর। বিষয়টি কঠিন, সন্দেহ নেই। দিন-রাত চিন্তা করতে থাকেন তিনি। একদিন পুরাপুরি জলে ভর্তি চৌবাচ্চায় অবগাহন করতে গিয়ে আর্কিমিডিস দেখলেন খানিকটা জল উপচে পরে গেল। নিশ্চয়ই তাঁর দেহের সমান আয়তনের জল উপচেছে। এই কথা চিন্তা করেই তিনি দৌড়তে দৌড়তে রাস্তায় বেরুলেন, আর বলতে লাগলেন Eureca, Eureca—আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি। একটা খাঁটি সোনার মুকুট জলপূর্ণ পাত্রে ডোবালে খানিকটা জল উপচে পড়বে। এখন রাজার মুকুটটি জলে ডুবিয়ে আর্কিমিডিস ধরতে পারলেন ওটা খাঁটি সোনার কিনা।

এই পরীক্ষা থেকে পৃথিবীর মানুষ পেল একটি মৌলিক সূত্র-যা এখন আর্কিমিডিসের সূত্র বলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে পরিচিত! সূত্রটা হল এই কোন জিনিসকে জলের মধ্যে ওজন করলে তার ওজন কমে যায়। কতটা কমে? বস্তু কর্তৃক অপসারিত জলের যা ওজন বস্তুটির ওজন সেই পরিমাণ কমে। আর শুধু জল নয় প্রত্যেক তরল পদার্থ এমন কি গ্যাসীয় পদার্থ সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে। কি বেলুন উড়াতে, কি জাহাজ ভাসাতে, আর্কিমিডিসের এই সূত্র আজ দু'হাজার বছর ধরে তার জয়বার্তা ঘোষণা করে চলেছে।

একটি লিভারের প্রধান অংশ হল একটি বড় দণ্ড, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে দণ্ডটি উঠানামা করতে পারে। এই বিন্দুটি দণ্ডের একটি প্রান্তের কাছাকাছি থাকবে, আর দণ্ডের অন্য প্রান্তে থাকবে ভারি জিনিসটা যাকে তুলতে হবে। দণ্ডটির নির্দিষ্ট বিন্দুর নিকটতম প্রান্তে বল প্রয়োগ করতে হবে। দণ্ডটির অপর প্রান্তের তুলনায় নির্দিষ্ট বিন্দুটির নিকটতম প্রান্ত যত বড় হবে, তত কম বল প্রয়োগ করে বেশি ভারি জিনিস তোলা যাবে।

এই হল আর্কিমিডিসের আর এক আবিষ্কার।

তিনি বলেছিলেন, একটা লিভারকে যদি অনেক বড় করতে পারা যায় তবে এমন কোন ভারি জিনিস নেই যা ওই লিভারের সাহায্যে তুলতে পারা যাবে না। রাজাকে তিনি বললেন, আমাকে একটা দাঁড়াবার জায়গা দিন, আমি সমস্ত পৃথিবীটাকে তুলতে পারব।

আমরা সবাই জানি কপিকলের সাহায্যে, সুবিধাজনক স্থান হতে বল প্রয়োগ করে, একটা ভার তোলা যায়। এই কপিকলও আর্কিমিডিসের দান। জ্যামিতিতে ইউক্লিড যা দিয়ে গিয়েছিলেন গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস তা নানা দিকে প্রসারিত করলেন। একটি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের মধ্যে অনুপাত নিরূপণ করলেন তিনি। একটি স্তম্ভকের মধ্যে একটি গোলক আছে ? গোলকটি স্তম্ভকের তিন দিক স্পর্শ করেছে আর উভয়ের উচ্চতা এক। আর্কিমিডিস সর্ব প্রথম দেখালেন যে এরূপ ক্ষেত্রে গোলকের আয়তন স্তম্ভকের ভিতরকার আয়তনের ঠিক দুই-তৃতীয়াংশ হবে।

রোমানরা সিরাকুজ রাজ্য দখল করতে এল। রাজা তখন আর্কিমিডিসের উপর নগর রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করলেন। কঠিন দায়িত্ব সন্দেহ নেই। আর্কিমিডিস এমন এক যন্ত্র আবিস্কার করলেন যা দূর থেকে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে থাকবে। শত্রু সৈন্যকে নাস্তানাবুদ করলেন তিনি, ডুবিয়ে দিলেন তাদের অনেক জাহাজ। তিনি আর এক কৌশল অবলম্বন করলেন। বিক্ষিপ্ত সূর্য রশ্মিকে যদি এক জায়গায় সংহত করা যায় তবে সেখানে প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যাবে আর্কিমিডিস কয়েকখানি অবতল দর্পণের সাহায্যে শত্রুর জাহাজের পালের উপর সংহত করলেন সূর্যরশ্মি, মুহূর্তমধ্যে জাহাজ জ্বলে উঠল রোমান সৈন্যরা আর্কিমিডিসের উদ্ভাবন কৌশল দেখে এত ভয় পেল যে সে যাত্রায় তারা ফিরে চলে গেল।

কিন্তু কিছুদিন পরে শত্রুসৈন্য আবার হানা দিল, আর শেষ অবধি সিরাকুজ রাজ্য দখল করল। রোমান সৈন্যাধ্যক্ষ মার্থেলস

আর্কিমিডিসের প্রতিভায় এত চমৎকৃত হয়েছিলেন যে তিনি শহর দখল করে নিজের সৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, তারা যেন আর্কিমিডিসকে কিছু না বলে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল অন্যভাবে। আর্কিমিডিস শত্রুর আগমনের কথা শোনেন নি। তিনি এক জায়গায় বালি ছড়িয়ে বিভিন্ন রেখা কেটে তার উপর একটা লাঠি পুঁতে এক জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিলেন। একজন রোমান সৈন্য এসে আর্কিমিডিসকে তাঁরা নাম জিজ্ঞাসা করল। অন্যমনস্ক বিজ্ঞানী তখন সৈন্যটিকে বললেন, একটু অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আমার সমস্যার সমাধান হয়, আর এই বালির উপর পা রাখবে না। সৈন্যটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটল আর তখনকার দিনের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নির্মমভাবে নিহত হলেন।

রোমানরা যখন জানতে পারল নিহত ব্যক্তিটিকে, তখন তারা সম্মানের সঙ্গে তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করল, তার উপর তৈরি করল একটি স্মরণস্তম্ভ—স্তম্ভটীর গায়ে উৎকীর্ণ করে দিল আর্কিমিডিসের দুটি প্রিয় চিহ্ন—একটী বেলন আর একটি বর্গক্ষেত্র। এই দুটি জিনিস নিয়ে তিনি যে সব কাজ করেছিলেন সেজন্য তাঁর গর্বের সীমা পরিসীমা ছিল না। গণিতের দুই বিভাগেই—বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক—তাঁর দান অসামান্য। এই শতাব্দীর গণিতশাস্ত্রের পরম পণ্ডিত আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর এই পূর্বসূরী সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করেছেন : 'Archimedes was a giant, a scientist and mathematician of extraordinary greatness one man and one intellect—a host in itself' গ্রীসের প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে এই উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গ্যালিলিও

(১৫৬৪-১৬৪২)

ইটালি দেশে পিসা শহর। সেই শহরের এক গির্জার অভ্যন্তর। ছাত হতে নেমে এসেছে একটা শিকল, তার থেকে ঝুলছে একটা লণ্ঠন। উপরদিকে জানলাগুলি খোলা, এক একবার হাওয়া আসছে আর ঝাড়টাকে দোলাচ্ছে। গির্জার মধ্যে একটি বালক বসেছিল, আর ঝাড়ের দোলনটা লক্ষ্য করছিল। তার মনে হল দোলনটা বেশি হোক বা কম হোক, দোলনকাল যেন একই। কিন্তু, বিমুগ্ধ সেই বালক মনে মনে চিন্তা করে, দোলনকাল কি করে মাপা যেতে পারে? এ হল তিনশো বছর আগেকার কথা, ঘড়ি তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বালকটি ফস্ করে নিজের নাড়ীটা টিপে সময় নির্ধারণ করতে লাগল, আর দেখল সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। দোলনের বিস্তার কম বেশি যাই হোক, দোলন কাল সমান।

সতর বছরের এই বালক গ্যালিলিও সেদিন বিজ্ঞানের এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবে নিল যে, নাড়ীর স্পন্দন দিয়ে যদি দোলকের দোলনকাল মাপা যায় তবে অন্য দিকে একটা দোলকের দোলনকাল লক্ষ্য করে নাড়ীর স্পন্দনকাল মাপা সম্ভব হবে। বেশি দিন গেল না, সে একটা ছোট যন্ত্র তৈরি করল যা দিয়ে নাড়ীর গতি মাপা সম্ভব হল। এই যন্ত্রে ডাক্তারদের খুব কাজে লেগে গেল, গ্যালিলিওর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

১৫৬৪,১৫ ফেব্রুয়ারি গ্যালিলিও ইটালির পিসা শহরে জন্মগ্রহণ

করেন। এই বছরটি চিহ্নিত হয়ে আছে আর একটি প্রতিভার আবির্ভাবের জন্য। তিনি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। গ্যালিলিওর বাবা ভিনসেনজিও গ্যালিলি ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ ও গণিতজ্ঞ। কিন্তু এসব চর্চায় পয়সা নেই ভেবে তিনি ছেলেকে কাপড়ের ব্যবসায় লাগিয়ে দিলেন। গ্যালিলিও দুদিনেই দেখলেন, সে কাজ তাঁর নয়। তিনি বাবাকে বুঝিয়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে গেলেন।

প্রাচীন কালে গ্রীসদেশের দার্শনিকেরা যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন হাজার বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পড়ান হয়ে আসছিল। কিন্তু গ্যালিলিও ছাত্র হয়ে এসে সব কথাতেই অধ্যাপকদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে লাগলেন। তখনো অবধি গ্যালিলিও গণিতবিদ্যার বিশেষ কিছু জানতেন না। এক সুযোগ এল। এই সময় একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গণিতের ছাত্রদের কাছে কতকগুলি বক্তৃতা দিতে থাকলেন। গ্যালিলিও গণিতের ছাত্র নন, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি ঐসব বক্তৃতা শুনে যেতেন। শেষে একদিন সাহস করে তিনি ঐ অধ্যাপকের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। অধ্যাপক গ্যালিলিওর কথা বার্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ছাত্র হিসাবে নিয়ে এলেন। অল্পকালের মধ্যে একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বলে গ্যালিলিও প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

এর কিছুদিন পরে তরুণ গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁর বেতন হল সপ্তাহে মাত্র পাঁচ শিলিং। এখন অপর অধ্যাপকদের সঙ্গে গ্যালিলিওর লাগল ঠোকাঠুকি। বহু শতাব্দী আগে অ্যারিস্টটল বিজ্ঞানের যেসব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, নির্বিচারে লোকে সেসব এতদিন মেনে আসছিল। গ্যালিলিও বললেন, ওসবের প্রত্যেক কথা যাচাই করে দেখতে হবে। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন একটা একশো পাউণ্ডের ওজন এবং এক পাউণ্ডের একটা ওজন উপর থেকে ছেড়ে দাও, দেখবে একশো পাউণ্ড

ওজনের জিনিসটা একশো গুণ দ্রুত পড়বে। গ্যালিলিও বললেন, বাজে কথা, তারা এক সঙ্গেই পড়বে।

১৫৯১। একদিন সকালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা ও অন্য অনেক দর্শক ঐ জায়গার বিখ্যাত আনত মিনারটির পাদদেশে সমবেত হলেন। গ্যালিলিও উঠলেন মিনারের উপরে, আর সেখান থেকে একটা ছোট বল ও তার একশোগুণ ভারী একটা বড় বল একসঙ্গে নীচের দিকে ছাড়লেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে বল দুটি একই সঙ্গে মাটিতে পড়ল, মাটিতে আঘাত করার শব্দও তারা শুনল। এতদিন ধরে মানুষ যে ধারণা করে আসছিল প্রকৃতি সুনিশ্চিতভাবে আজ তার প্রতিবাদ করল। কিন্তু নিজেদের চোখ কান যাই জানাক, এই বলাবলি করতে করতে লোকেরা বাড়ি ফিরল,—তা বলে কি শাস্ত্র বাক্য অমান্য করতে হবে; গ্যালিলিওকে যে করেই হোক দাবিয়ে রাখা দরকার। আর তারা করলও তাই। সে কথায় পরে আসছি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ লক্ষ্য করেছে যে পৃথিবীর উপরকার ও পৃথিবীর কাছাকাছি পদার্থের উপর পৃথিবীর একটা আকর্ষণ আছে। গ্যালিলিও দেখলেন যে এই আকর্ষণের ফলে উপর দিকে ঢিল ছুঁড়লে তা নীচে নেমে আসে, একটা আনততল দিয়ে বল গড়িয়ে চলে। গ্যালিলিও এও লক্ষ্য করলেন, উপর থেকে যখন কিছু পড়ে তখন তার একটা ত্বরণ থাকে, সেই ত্বরণের মান একেবারে সুনির্দিষ্ট। তখনো নিউটন জন্মাননি, প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাঁর প্রবর্তিত গতিবিদ্যা। কিন্তু গ্যালিলিও প্রতিক্ষু পদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম প্রকাশ করলেন। পিসাতে তাঁর শত্রুসংখ্যা বাড়তে লাগল, বাধ্য হয়ে তাঁকে এখানকার চাকরি ছাড়তে হল, কিন্তু পাডুয়াতে তিনি এখানকার চেয়ে ভাল এক চাকরি পেলেন। পাডুয়াতে তিনি আঠারো বছর অধ্যাপনার কাজ করলেন, দেশময় তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ল।

১৬০৯। ভেনিসে এসেছেন গ্যালিলিও। শুনলেন, লিপারসে

নামে একজন চশমা বিক্রেতা এক যন্ত্র তৈরি করেছে যা দিয়ে দূরের জিনিস কাছে দেখায়। লিপারসের উদ্ভাবিত যন্ত্রটি দেখবার চেষ্টা না করেই গ্যালিলিও নিজে সেই রকমের একটি যন্ত্র তৈরির কাজে লেগে গেলেন। একটা অর্গান পাইপ নিয়ে তার ছুদিকে ছুখানা চশমার কাচ বসালেন, একখানা উত্তল লেন্স অপর খানা অবতল লেন্স। দূরবীন তৈরি হল, দূরের জিনিস কাছে দেখাল। এদিয়ে গ্যালিলিও অনেক নতুন নক্ষত্র দেখলেন খালি চোখে যাদের দেখা যায় না। দিন দিন তিনি যন্ত্রটির উন্নতি সাধন করতে লাগলেন।

একদিন। সেদিন রাতে তাঁর উদ্ভাবিত একটা ভাল যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে গ্যলিলিও আনন্দে অধীর হলেন। এর আগে কোনদিন মানুষ যা দেখেনি সেসব তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল। চাঁদে ঐ যে সব কালো কালো রেখা আমরা দেখি, সাধারণ লোকে যা চাঁদের কলঙ্ক বলে, গ্যালিলিও দেখলেন, সেগুলো ওখানকার পর্বতশ্রেণী, মাঝে মাঝে গভীর গর্ত। পরিষ্কার রাতে দেখা যায় সমস্ত আকাশ জুড়ে এধার থেকে ওধার অবধি আলোর একটা ধারা যেন চলে গিয়েছে, একে বলা হয় ছায়াপথ। গ্যালিলিও তাঁর তৈরি দূরবীক্ষণ দিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, ওটা বহুসংখ্যক নক্ষত্রের সমষ্টি, আর কিছু নয়।

১৬১০, ৭ জানুয়ারি। গ্যালিলিওর জীবনে একটি স্মরণীয় তারিখ। সেদিন তিনি তাঁর তৈরি এক বড় দূরবীক্ষণ দিয়ে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে তাকালেন। দেখলেন, ঐ গ্রহের পূর্বদিকে ছুটি, আর পশ্চিম দিকে একটি, এই তিনটি নক্ষত্র রয়েছে, একটি সরল রেখায় অবস্থিত। পরদিন আবার দেখলেন, লক্ষ্য করলেন তাদের স্থান পরিবর্তিত হয়েছে, তিনটি চলে গিয়েছে বৃহস্পতির পশ্চিম দিকে। আর কয়েকদিন পরে দেখলেন, তারা সংখ্যায় তিনটি নয় চারটি। গ্যালিলিও চিন্তা করে ঠিক করলেন ওরা নক্ষত্র নয়, নক্ষত্র হলে ওরকম স্থান পরিবর্তন ঘটত না, নিশ্চয় ওরা চন্দ্র, বৃহস্পতির চার দিকে ঘুরছে, পৃথিবীর যেমন চন্দ্র আছে এরা সেই রকমই, তবে পৃথিবীর চন্দ্র একটা, এরা সংখ্যায় চারটি।

কিন্তু বিপক্ষ দলের লোকেরা একটা কথা তুললেন। তাঁরা বললেন, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে যদি পৃথিবী ও গ্রহরা ঘোরে, তবে চাঁদের যে রকম হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় শুক্রগ্রহের সেই রকম হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যাবে, আর এই গ্রহ যখন পৃথিবীর কাছে আসবে তখন তাকে অপেক্ষাকৃত বড় দেখাবে। গ্যালিলিও পরে যে বড় দূরবীন তৈরি করলেন তার সাহায্যে তিনি শুক্রের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করলেন, আর এও দেখলেন যে, ঐ গ্রহ যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসে তখন তাকে বড়ই দেখায়। সূর্যে কালো কালো দাগ দূরবীক্ষণে দেখা দিল, ঐ দাগগুলো সরে সরে যাচ্ছে, আবার নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেখা দিচ্ছে। সূর্যকে যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ সুনিশ্চিতভাবে তা প্রমাণ করল। গ্যালিলিওর শত্রুরা বিভ্রান্ত হল। এই সময় গ্যালিলিও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কেপলারকে[১] একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: প্রিয় কেপলার, আমরা দুজন কাছাকাছি থাকলে খুব একচোট হেসে নিতাম। পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপককে দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র নিরীক্ষণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলাম, তিনি এলেন না, পাছে চোখে দেখে স্বীকার করতে হয় যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে।

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত সফল হল। তিনি বিচারকদের সম্মুখে আনীত হলেন। অভিযোগ, শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার বিরুদ্ধ কথা তিনি প্রচার করেছেন। বলা বাহুল্য বিচারকদের মধ্যে একজনও বিজ্ঞানী ছিলেন না গ্যালিলিওর প্রতি আদেশ হল হয় তিনি মত প্রচারে বিরত থাকবেন, আর তা না হলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। গ্যালিলিও প্রথমটায় স্বীকৃতি দিয়ে চলে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কথা রাখলেন না, যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রীয় মত খণ্ডন করে ও

---

১ জোহানস্ কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) একজন প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, কোপারনিকাসের এই মতবাদ গ্যালিলিও সমর্থন করতেন।

নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করে তিনি এক পুস্তক প্রকাশ করলেন। ফলে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ রাখা হল, তবে লোকজন দেখা করার কোন বাধা রইল না।

এখানে একদিন ইংলণ্ডের মহাকবি মিলটন গ্যালিলিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে জানান যে তাঁর বই ইংলণ্ডের বহুলোকে খুব আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছে। অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হতে লাগল, তিনি বধির হলেন। শেষে হারালেন দৃষ্টিশক্তি। যে পৃথিবীকে পুরাতন কালের জ্ঞানীদের বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে তিনি লক্ষগুণ সম্প্রসারিত করেছিলেন, আজ তা তাঁর কাছ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

দৃষ্টিহীন, বয়স আশির কাছাকাছি, তখনো গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তিনি তাঁর পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন, কি করে একটা দোলকের সাহায্যে একটা ঘড়ির চলার হার কমানো বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সেই নতুন ঘড়ি তৈরি হবার আগে, ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

গ্যালিলিওর মৃত্যু হলো। তাঁর শত্রুরা পোপকে দিয়ে ঘোষণা করালেন যে, তাঁর কবরের উপর কোন সমাধিস্তম্ভ থাকবে না, কারণ তিনি বন্দী অবস্থায় দেহত্যাগ করেছেন। তখন অবশ্য তা লোক মেনে নিল কিন্তু ভবিষ্যতে সংস্কার মুক্ত দেশবাসী সেখানে একটি উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছিল। আর আজ পৃথিবীতে যে কেউ ঘড়ির একটি টিক টিক শব্দ শোনে বা একটি দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে বহির্জগৎ নিরীক্ষণ করে, সেই-ই গভীর শ্রদ্ধায় গ্যালিলিওকে স্মরণ করে। তা ছাড়া তাঁর লেখা 'dialogues on To New sciences' ও 'A dialogue on the Two Principal Systems of the World'—গ্রন্থদুটির মধ্যে গ্যালিলিও অমর হয়ে আছেন বিজ্ঞানী সমাজে। বিজ্ঞানী সমাজে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক হিসাবে স্বীকৃত ও সম্পূজিত।

স্যার আইজাক নিউটন

(১৬৪২-১৮২৭)

১৬৪২ সালটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে দুটি কারণে : এক—এই বছরের জানুয়ারি মাসে গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ; দুই—এই বছরের ডিসেম্বরের বড়দিনটিতে জন্মগ্রহণ করেন নিউটন।

বিজ্ঞান জগতের এই দিকপাল সম্পর্কে ইংরেজ কবি পোপ লিখেছিলেন :

Nature and Nature's Laws lay hid in night,
God said, 'Let Newton be' and all was Light,

অর্থাৎ, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ তমসাবৃত ছিল; ঈশ্বর বললেন, —নিউটন আসুক। সমস্ত আলোকিত হল।

কথিত আছে প্রুশিয়ার রাণী নিউটন সম্বন্ধে সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ লিব্‌নিজকে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। লিব্‌নিজ বলেন,—পৃথিবীর আরম্ভ থেকে নিউটনের সময় পর্যন্ত সকল দেশের গণিতজ্ঞ যা দিয়ে গিয়েছেন সব যদি এক পাল্লায় থাকে, আর নিউটনের অবদান যদি অন্য পাল্লায় রাখা যায়, তবে নিউটনের দিকটাই ঝুলে পড়বে।

অথচ এই নিউটনই বৃদ্ধ বয়সে একদিন বলেছিলেন, আমি তীরে দাঁড়িয়ে একটি ছোট ছেলের মতো খেলা করে গিয়েছি, কখনো একটা ঘষা পাথর কুড়িয়েছি, কখনো একটা চক্‌চকে শামুকের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু বিরাট জ্ঞান সমুদ্রের কোন খবর পাইনি।

ইংলণ্ডের লিঙ্কন সায়ারের একটি গ্রামে আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। একটা ইংরেজি প্রবাদ আছে, শৈশবই ভবিষ্যৎ মানুষকে

সূচিত করে যেমন দিনকে সূচিত করে প্রাতঃকাল। নিউটনের পক্ষে কিন্তু কথাটা খাটেনা। স্কুলে আইজাক ছিল ক্লাসের ছেলেদের সবার নীচে, আর খুব যে শান্ত ছিল না তার একটা প্রমাণ এখনো বিদ্যমান সেই স্কুলের একটা জানলার কাঠের উপর ছুরি দিয়ে খোদাই করা I Newton আজো দর্শকদের দৃষ্টিপথে পড়ে। একটি ঘটনায় আই-জাকের জীবনের গতির মোড় ফিরল। ক্লাসে তার ঠিক উপরের ছেলেটি একদিন আইজাকের পেটে জোরে একটা ঘুষি মারল। রোগা লিক্‌লিকে হলেও আইজাক এর সমুচিত উত্তর দিল, ছেলেটিকে মাটিতে ফেলে বেদম প্রহার করল। এখন আইজাকের জেদ হল, লেখাপড়াতেও সে ঐ সহপাঠীকে ছাড়িয়ে যাবে। তাই হল, অল্পদিনের মধ্যে আইজাক শুধু যে ঐ ছেলেটির উপর উঠল তা নয়, ক্লাসের সেরা ছাত্র বলে পরিগণিত হল।

স্কুলের বাঁধাধরা লেখাপড়া ছাড়া অন্য অনেক দিকে আইজাকের মাথা খেলত। এই সময় একদিন ঐ জায়গায় চাষীরা সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে বলাবলি করতে লাগল যে শীঘ্রই একটা যুদ্ধ হবে বা মহামারী দেখা দেবে, কারণ তারা আকাশে একটা নতুন ধূমকেতু দেখেছে। ব্যাপারটা দাঁড়াল নিউটনের একটা খেলা থেকে। নিউটন ঘুড়ি তৈরি করতে ওস্তাদ ছিল। একদিন সন্ধ্যায় সে ঘুড়ির ল্যাজে একটা কাগজের ঠোঙা বেঁধে তার মধ্যে একটা বাতি জ্বালিয়ে উড়াতে লাগল। পাড়ার লোকেরা যখন ব্যাপারটা সঠিক জানল তখন স্বীকার করল যে চাষার ছেলে হলে কি হয়, আইজাকের বুদ্ধি আছে।

সূর্যঘড়ি (Sun-dial) তৈরি করল আইজাক। মাটির সঙ্গে নির্দিষ্ট কোণ করে একটা কাঠি পোঁতা ছায়ার অবস্থিতি দেখে দিনের বেলায় কখন কটা বাজল বলে দেবে সেই ঘড়ি। তার উদ্ভাবনশীল মস্তিষ্ক তৈরি করল অদ্ভুত রকমের বায়ুচালিত একটা যন্ত্র। তারপর তৈরি হল একটা জল ঘড়ি। তখনো পর্যন্ত স্প্রিং দিয়ে ঘড়ি চালাবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়নি। আইজাক প্রত্যহ সকালে উঁচুতে রাখা একটা

পাত্রে জল ঢেলে আসত। সেই জল ধীরে ধীরে পড়ত, আর তাই থেকে চলত ঘড়ির কাঁটা।

দেখতে দেখতে আইজাক পনর বছরের হলেন। তার মা স্থির করলেন যে আইজাক একজন চাষী হবে, তিনি ছেলেকে মাঠে গরু চরাতে পাঠালেন। আইজাক সেখানে ছোট নদীতে জলের স্রোতের সাহায্যে কল চালাতে ব্যস্ত, ওদিকে গরুগুলি পরের ক্ষেতে মনের আনন্দে শস্য খেয়ে চলেছে। একদিন দমকা ঝড় এল, কোথায় গরুগুলি সামলাবে, না, আইজাক একবার ঝড়ের দিকে মুখ করে, আবার বিপরীত দিকে লাফাচ্ছে, তার থেকে ঝড়ের বেগ নিরূপণ করবে। মা দেখলেন, এ ছেলেকে দিয়ে চাষের কাজ হবে না, তিনি তখন ভাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলেকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন। উনিশ বছর বয়সে আইজাক কেমব্রিজে পড়তে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব খরচ তাঁর পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় বলে কিছুকাল প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্য চাকরের কাজ করতে থাকলেন।

তাঁর জীবনেতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রথম প্রথম ছাত্র হিসাবে নিউটন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। ১৬৬৪ সালে তিনি একটা বৃত্তি পরীক্ষা দিলেন। তাঁকে বৃত্তি দেওয়া হল, কিন্তু পরীক্ষকেরা মন্তব্য করলেন যে নিউটনের জ্যামিতির জ্ঞান খুবই সামান্য। পরের বছরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পেলেন। এরপর থেকেই তিনি গণিতে নব নব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে লাগলেন। সে সব পদ্ধতি আজো চলিত রয়েছে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে যেমন লেশমাত্র অহমিকা ছিল না, তেমনি বিনয় তাঁর এত বেশি ছিল যে প্রথম প্রথম আইজাক তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ করেন নি, পরে যখন শুনলেন অপরে সেইসব বিষয় আলোচনা করছেন, তখন তিনি এগুলি সাধারণের গোচরে আনলেন।

১৬৬৫। লণ্ডন শহরে প্লেগ দেখা দিল, আর তা কেমব্রিজ অবধি ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল, নিউটন তখন

ফিরে এলেন তাঁদের পল্লী বাস ভবনে। এখানে তিনি কয়েকটি সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত রইলেন। নিউটনের আগে কোপারনিকাস (১৪৭৩) বলেছিলেন যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, আর গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছিল। গ্রহরা ঐ রকম ঘুরলেও কি কারণে ঐ ভাবে ঘুরছে তার কোন মীমাংসা হয়নি।

এই সময় শরৎকালের এক সন্ধ্যায় বাগানে বসে নিউটন গভীর ভাবে ঐ কথা ভাবছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠল। নিউটন চিন্তা করতে লাগলেন, কেন ঐ চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে। আর সব সময় একই পথে ঘুরবে। এই চিন্তার মধ্যে তিনি যখন তন্ময় হয়ে আছেন তখন গাছ থেকে একটা আপেল ফল পড়ার শব্দে এল তাঁর কানে। অমনি নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল তাঁর মনে।

উর্দ্ধে অবস্থিত প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতি পৃথিবীর একটা টান আছে, একথা অনেকদিন আগে থেকেই লোকের জানা ছিল। এখন নিউটন চিন্তা করলেন, এই আকর্ষণ কি চন্দ্র অবধি পৌঁছেছে, আর তারই ফলে কি সূর্যের চারদিকে চন্দ্র ঘুরছে। একটা দড়ির ডগায় ঢিল বেঁধে যদি সেটাকে ঘোরান যায় তবে ঢিলটা বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে, ঢিলের প্রতি আকর্ষণই সেটাকে ঘোরায়। নিউটন স্থির করলেন, এই মতোই চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ সেই আকর্ষণই চন্দ্রকে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাচ্ছে, আবার পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণের ফলে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বিজ্ঞানী তাঁর এই আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। নিউটন সেই নিয়মের সন্ধান পেলেন যে নিয়মের বশে চলছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড।

আবিষ্কৃত হলো যুগান্তকারী 'থিওরি অব গ্র্যাভিটেশন' বা মহাকর্ষ তত্ত্ব। সংক্ষেপে তত্ত্বটি এই: ব্রহ্মাণ্ডে (UNIVERSE) প্রতি পদার্থ সর্বদা আকর্ষণ করছে প্রতি পদার্থকে, তাদের মধ্যে ব্যবধান যতই হোক না কেন। এই আকর্ষণ বল পদার্থ দুটির ভরের উপর আর বিপরীত ভাবে উভয়ের দূরত্বের বর্গফলের উপর নির্ভর করে।

প্রকৃতিতে যত রকম বলের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার মধ্যে এই মহাকর্ষ বল সবচেয়ে ব্যাপক। এর-ব্যাপকতার কোন সীমা নেই। ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর প্রান্তস্থিত একটি নক্ষত্র আর আমাদের এই পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ আছে, পৃথিবী কেন, আমার দেহের সঙ্গেও একটা আকর্ষণ বিদ্যমান। অবশ্য আমার দেহের সঙ্গে আকর্ষণের মাত্রা খুবই কম, এত কম যে তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা চলেনা, কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সূর্য থেকে আলো আসছে, মাঝে অস্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে আমরা সেই আলো অবরোধ করতে পারি, তাপও রোধ করতে পারি, তড়িৎচুম্বকীয় বলকেও আড়াল করতে পারি, কিন্তু কোন উপায়ে কোন রকমে এই মহাকর্ষ বল রোধ করতে পারি না।

বাইরের কোন পদার্থের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর আকর্ষণবলের হিসাব করতে হলে বিষম অসুবিধায় পড়তে হয়। পৃথিবী তো অগণিত পদার্থ কণিকার সমষ্টি। আর, সব কণিকা তো একই দিকে এবং সমদূরে নেই। এতগুলি বিভিন্ন দিকের বলসমষ্টির হিসাব কি রকমে হবে! কিন্তু নিউটন হিসাবটা সহজ করে দিলেন। তিনি বললেন, একটি গোলকীয় পদার্থের সমস্ত ভর তার কেন্দ্রে নিহিত আছে। এই রকম ধরা যেতে পারে। প্রথম প্রথম নিউটন দেখলেন যে, এই হিসাব অনুসারে চন্দ্রের যে গতিপথ হবার কথা উহা ঠিক সেই পথে চলেনা। ম্রিয়মান হলেন তিনি, তবে কি তাঁর হিসাব ভুল! ঠিক এই সময় ভৌগোলিকরা বললেন যে, এতদিন পৃথিবীর যে আয়তন ধরা হচ্ছিল তা ঠিক নয়। তাঁরা নির্ধারণ করলেন সঠিক আয়তন। নিউটন এই আয়তন তাঁর হিসেব নিয়ে দেখলেন যে তাঁর গণনা নির্ভুল।

এখন নিউটন তাঁর মহাকর্ষ-সূত্র প্রয়োগ করে অন্য গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতুর গতিপথ স্থির করলেন। সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটাও তো এই সূত্র দিয়ে মীমাংসিত হল। কিন্তু একটা কথার উত্তর বহুদিন মিলল না। এই নিয়ম অনুসারে ইউরেনাস (URANUS) গ্রহের যে পথে চলা

উচিত ঐ গ্রহ ঠিক সেই পথে চলে না। তবে কি নিউটন প্রবর্তিত এই মহাকর্ষ সূত্রে কোথাও কিছু গলদ আছে! কাছে অন্য গ্রহ থাকলেও এই রকম হতে পারে। যদি তাই হয়, অনাবিষ্কৃত গ্রহের অবস্থিতি কোথায়, তার ভর কত হবে, তার ঘোরবার পথ কিরকম হবে। এসব দুজন জ্যোতিষী পৃথক ভাবে অঙ্ক কষে বের করলেন। হিসাব শেষ করে তাঁদের একজন বার্লিন মানমন্দিরের অধ্যক্ষকে জানালেন যে আকাশের ঠিক অমুক জায়গাটি দূরবীক্ষণ দিয়ে লক্ষ্য করলে ঐ অনাবিষ্কৃত গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই করা হল, নেপচুন (NEPTUNE) গ্রহ আবিষ্কৃত হল।

মহাকর্ষ তত্ত্ব আবিষ্কারের পর নিউটন বেগ (Velocity), ভর ও ত্বরণ (Acceleration) সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা সুনির্দিষ্ট করে গতিবিদ্যা রচনা করলেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর তাঁর এই আবিষ্কারকে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছিলেন। তারপর একদিন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হ্যালি কয়েকটা বিষয় আলোচনা করবার জন্য কেমব্রিজে নিউটনের কাছে আসেন। হ্যালি নিউটনের আবিষ্কারের কথা অবগত হলেন আর বিজ্ঞানীসমাজে তা প্রকাশ করলেন। এর দু বছর পরে ১৬৮৬ সালে, প্রকাশিত হল বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, নিউটনের ‘প্রিনসিপিয়া’ [১] ল্যাটিন ভাষায় লেখা। এই বই প্রকাশেরও একটা ইতিহাস আছে। ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি এই বই ছাপবার সিদ্ধান্ত করল, কিন্তু সোসাইটির আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ, কর্মচারীরা বেতন পায় না। হ্যালি ছিলেন ধনীর সন্তান। তিনি সোসাইটিকে টাকা দিয়ে ঐ বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। ল্যাটিনে লেখা হয়েছিল ঐটা জন্য সে তখন এটাই ছিল বিজ্ঞানের ভাষা।

নিউটনের প্রতিভা যিনি জনসমাজের গোচরে এনেছিলেন, যাঁর

---

১. বইটির সম্পূর্ণ নাম : **Philosophiae Naturalis Principia** ; বইটি তিনখণ্ডে সমাপ্ত। ইংরেজী অনুবাদের নাম : **Mathematical Principles of Science**।

বদান্যতায় নিউটনের প্রিন্‌সিপিয়া প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল, সেই মহামতি হ্যালির গবেষণা এখানে একটু উল্লিখিত হল। ১৬৮২-সালে আকাশে একটি ধূমকেতু দেখা দেয়। হ্যালি এই ধূমকেতুর গতিপথ সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করলেন। নিউটনের 'প্রিন্‌সিপিয়া' প্রকাশিত হবার পর হ্যালির মনে হল যে ঐ ধূমকেতুর পথ উপবৃত্ত আকারের হবে, তার অক্ষটা খুব লম্বা আর সেটা সূর্যের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। পূর্বে যেসব ধূমকেতু আকাশে দেখা গিয়েছে তাদের আসার সন তারিখ হ্যালি খুঁজে বের করলেন, আর নিউটনের হিসাবের উপর নির্ভর করে তিনি বললেন যে, ঠিক এই ধূমকেতুকে ১৬০৭ সালে দেখা গিয়েছিল। আর ভবিষ্যতে ১৭৫৭ সালে আবার একে দেখা যাবে। অন্য জোতির্বিদেরা হ্যালির এই কথায় অবাক হয়ে গেলেন, এবং তাঁরা ১৭৫৭ সালের প্রতীক্ষায় রইলেন।

এল বহু প্রতীক্ষিত ১৭৫৭ সাল। ঐ ধূমকেতুকে দেখবার জন্য জ্যোতির্বিদেরা রাত্রির পর রাত্রি আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। কই তার তো দেখা নেই। এই সময় ক্লারট নামে একজন ফরাসি জ্যোতির্বিদ হিসাব করে বললেন যে, এই ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের খুব কাছ দিয়ে আসবে; বৃহস্পতির আকর্ষণে এর আসতে কিছু দেরী হতে পারে। আরো দুমাস চলে গেল, ধূমকেতুর দেখা নেই। জ্যোতির্বিদেরা কিন্তু নিরাশ হলেন না। শেষে সেই বছরের ২৩ ডিসেম্বর একটি ছোট নতুন জ্যোতিষ্ক দূরবীক্ষণে দেখা দিল। কয়েক দিনের মধ্যে বিরাট পুচ্ছ সমেত এই ধূমকেতু জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে এল, হ্যালির ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য বলে প্রমাণিত হল। হ্যালি তখন বেঁচে ছিলেন না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই ধূমকেতুটির নাম রাখা হয়, হ্যালির ধূমকেতু। এর পর ১৮৩৫ সালে একে দেখা গিয়েছিল, আবার ১৯১০ সালে। জ্যোতির্বিদরা বলেছেন এই গ্রহ আবার দেখা দেবে ১৯৮৫ সালে।

ছেলেবেলা থেকে নিউটনের জ্যোতির্বিদ্যায় খুব উৎসাহ ছিল।

কেমব্রিজে থাকাকালীন তিনি গভীর রাত্রি পর্যন্ত আকাশে নক্ষত্রদের গতি নিরীক্ষণ করতেন। কিন্তু তখন যেসব দূরবীক্ষণ পাওয়া যেত তা ব্যবহারে নিউটন ভারি বিরক্ত হতেন। সেসব দূরবীক্ষণ গ্যালিলিওর তৈরি দূরবীক্ষণের মতো। এতে প্রতিবিম্ব বেঁকে যেত, আর প্রতিবিম্বের চারপাশে নানা রকমের রং দেখা দিত। তখন নিউটন এর চেয়ে ভালো দূরবীক্ষণ তৈরি করতে মনস্থ করলেন।

এই সময় তিনি আলো সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ, শুধু একটা জানালার একটা সরু ছিদ্র দিয়ে সূর্যরশ্মি ঘরে ঢুকে অপরদিকে দেওয়ালের উপর পড়ল। এখন এই সূর্যরশ্মির পথে একখানা প্রিজম ধরে নিউটন দেখলেন যে, দেওয়ালে যেখানে সূর্যের আলো পড়ছিল সে স্থানটি নানা বর্ণের আলোকে রঞ্জিত হয়েছে। দেখলেন, প্রধানত সাতটি রং ছড়িয়ে পড়েছে,—বেগনি, অতিবেগনি, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল। বারবার তিনি এই পরীক্ষা করলেন। নানা রকমের প্রিজ্‌ম নিলেন। প্রত্যেকবার একই ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। এবার তিনি একখানা প্রিজ্‌মের বদলে পর পর দুখানা প্রিজ্‌ম ধরলেন, একটা আর একটার উল্টো করে বসান, এখন আর কোন রং দেখা গেল না। এইসব পরীক্ষা থেকে নিউটন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সূর্যের সাদা আলো বিভিন্ন বর্ণের আলোর সমষ্টি, প্রথম প্রিজ্‌ম দিয়ে যাবার সময় সেটা বিভিন্ন বর্ণের আলোতে ভেঙে গেল, এখন সামনে দ্বিতীয় প্রিজ্‌ম উল্টো করে ধরার ফলে ঐসব রঙিন আলো একত্র হয়ে সাদা আলোতে পরিণত হল।

আলোর সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আসার পর নিউটন দেখলেন যে প্রিজ্‌মে যা ঘটে, লেন্সে অনুরূপ ব্যাপার হয়ে থাকে। দূর থেকে যে আলো আসছে তা ধরবার জন্য দূরবীক্ষণে লেন্সই ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। নিউটন লেন্সের বদলে অবতল-দর্পণ বসালেন। এইভাবে তিনি যে দূরবীক্ষণ তৈরি করলেন তা লম্বায় ছ' ইঞ্চি। আর তার ব্যাস

এক ইঞ্চি। এতে প্রতিবিম্ব চল্লিশগুণ বড় দেখাল, পরিষ্কার হল। আশেপাশে রং আর রইল না। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দিরে যেসব দূরবীক্ষণ বসানো আছে তা নিউটন প্রবর্তিত প্রণালীতে গড়া।

অসীম ধৈর্যের সঙ্গে একটির পর একটি আবিষ্কার করে চলেছেন বিজ্ঞানী। একদিনের এক ঘটনা ছিল এই রকম। দিনের পর দিন অঙ্ক কষে যাচ্ছেন, আঁক কষার কাগজ স্তূপাকার হয়ে জমা হয়েছে, দু বছরের পরিশ্রমের ফল। গভীর রাত্রি, বাতি জ্বলছে, নিউটন কাজ বন্ধ করে বাইরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘরে তাঁর প্রিয় কুকুর 'ডায়মণ্ড' ঘুমচ্ছিল। কুকুরটা হঠাৎ উঠে মনিবকে দেখতে না পেয়ে লাফ দিয়ে যেই বাইরে যাবে অমনি জ্বলন্ত বাতিটা উল্টে পড়ল। কাগজগুলো জ্বলতে রইল। নিউটন তখনি ব্যাপারটা দেখে ধীরভাবে শুধু বললেন,—ডায়মণ্ড, তুমি বুঝলে না কি করলে। যাক্ অঙ্কগুলো আবার কষতে হবে।

এই আপনভোলা বিজ্ঞানী সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। পাশের ঘরে ঝি নৈশখাবার রেখে বহুক্ষণ অপেক্ষা করল। মনিব এলেন না দেখে সে স্থির করলে, আজ রাত্রে তিনি খাবেন না। খাবার নিয়ে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিউটন সেই ঘরে এসে দেখলেন, খাবার নেই। বললেন, কি ভুল হয়েছে, ভেবেছিলাম আজ খাইনি, দেখছি খেয়ে গিয়েছি।

নিউটন কোনদিন সম্মান চাননি, কিন্তু তাঁর উপর একের পর এক সম্মান বর্ষিত হতে থাকল। অল্প বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হলেন। তিনি রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে বৃত হলেন। পরে এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। মৃত্যুকাল অবধি তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭০৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি পার্লামেণ্টে প্রেরিত হলেন। ইংলণ্ডের টাঁক-শালের (Mint) অধিকর্তারূপে (Master) তিনি নিযুক্ত হলেন।

রাণী অ্যান তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করলেন। আইজাক নিউটন এখন স্যার আইজাক নিউটন।

এক ভদ্রলোককে নিউটন কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে দেন। তিনি সেইগুলি রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্য নিউটনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন নিউটনের বয়স সাতাশ, যে বয়সে মানুষ মাত্রই যশলাভের আশায় উদ্‌গ্রীব থাকে। কিন্তু নিউটন ভদ্রলোককে বললেন,—প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু আমার নামে নয়। এই বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ তাঁর আবিষ্কার প্রচারে কোনদিন ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নি। দূরবীক্ষণ নির্মাণের পর তিনি অনেক বছর তা গোপনে রেখেছিলেন, পরে রয়াল সোসাইটির সভ্যেরা যখন তার খবর পেলেন তখন তিনি সেটা সোসাইটিকে দিয়ে দিলেন। আজো সেটা সেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে।

১৭২৭ সালে, পঁচাশি বছর বয়সে স্যার আইজাকের মৃত্যু হয়। ওয়েস্টমিন্সটার এ্যাবেতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রশংসা বা পুরস্কার পাবার লোভ নয়, জ্ঞানলাভ ও আবিষ্কারের আনন্দ—প্রকৃত বিজ্ঞানী সেবীর এই হবে প্রেরণা। নিউটনের জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি। তাঁর যুগে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। কিন্তু তাঁর পূর্বসূরীদের কাছে তাঁর ঋণের কথা তিনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গিয়েছেন। এখানেই তাঁর প্রকৃত মহত্ব।

আঁতোঁ লরেঁ লাভোয়াসিয়ার

(১৭৪৩-১৭৯৪)

১৭৯৬ সালে ফরাসী সরকার আতোঁ লরেঁ লাভোয়াসিয়ারের সম্মানার্থে এক শোকযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এই অনুষ্ঠান; এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রশংসায় অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়েছিল সেদিন। কৃতজ্ঞ জাতির এই শ্রদ্ধা নিবেদন নিরর্থক ছিল না। কারণ দু'বছর আগে, ১৭৯৪ সালে, ফরাসী বিপ্লবের সন্ত্রাসবাদী তাঁকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহটি একটি অচিহ্নিত কবরে নিক্ষেপ করেছিল।

কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই একেবারে মানুষের কাজে লাগার আকারে জন্মায় না আরম্ভটা হয় ছোট রকমে, ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে, মন্থর গতিতে। যে বীজ পরে বৃহৎ বটবৃক্ষে পরিণত হয়, আদিতে তা থাকে ক্ষুদ্র। রসায়নবিদ্যায় লাভোয়াসিয়ার যা দিয়ে গেছেন তা খুব বেশি নয়, কিন্তু তা ছিল রসায়নবিদ্যার মূলের কথা। তাঁকে যথার্থই রসায়ন-বিদ্যার জনক বলা হয়।

লাভোয়াসিয়ারের আগে থেকেও রসায়নবিদ্যার অনুশীলন হয়ে আসছিল, কিন্তু সেসবের মধ্যে মাপজোখের হিসাব ছিল না। নিউটনের আবির্ভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের আবহাওয়ায় সূক্ষ্ম হিসাবপত্র দেখা দিল, রসায়নবিদ্যার চর্চাও সে আওতায় এসে পড়ল। লাভোয়াসিয়ার প্রচলিত জল্পনা কল্পনাকে যাচাই করলেন তুলাদণ্ডের সাহায্য নিয়ে। বললেন, বিজ্ঞান রূপকথা নয়, অলীক কল্পনাও নয়, এ একটা সত্য। এই সত্যকে প্রমাণ করতে হবে যুক্তি দিয়ে, নিক্তি দিয়ে। তবেই তো লোক তা মেনে নেবে।

. একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রত্যেক দাহ্য পদার্থে দুটি অংশ থাকে, ভস্ম ও ফ্লজিস্টন। পুড়লে ফ্লজিস্টনটা বেরিয়ে যায়, পড়ে থাকে ভস্ম। এই ছিল লাভোয়াসিয়ারের পূর্বকার রসায়নবিদ্‌দের কথা। এরই যুক্তিসম্মত ব্যখ্যা দিয়েছিলেন এই ফরাসী রাসায়নিক তাঁর একাগ্র গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে।

২৬ আগস্ট ১৭৪৩ সালে প্যারিসে এক ধনী পরিবারে লাভোয়াসিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী; প্রচুর জমিজমা ছিল তাঁর। খুব ছোটবেলায় তিনি মাতৃহীন হন। তাঁর পিতার স্নেহ আর এক কাকিমার নিঃস্বার্থ পরিচর্যা তাঁকে মানুষ করে তুলেছিল। তাঁর পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ছেলে বড় হয়ে আইন ব্যবসায় গ্রহণ করবে। সেজন্য লাভোয়াসিয়ার প্রস্তুতও হয়েছিলেন—আইনশিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। ব্যবসায়েও লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আইনের চেয়ে বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর আগ্রহ। কলেজে রসায়ন সম্পর্কে তত্ত্বীয় রসায়নবিদ্‌ অধ্যাপক বোর্দেলিয়ঁার বক্তৃতা তিনি শুনতেন খুব মনযোগ সহকারে। তবে বক্তৃতার সঙ্গে ক্লাসে যেসব পরীক্ষা (Demonstration) দেখান হতো, সেইগুলি তাঁকে সমধিক আকৃষ্ট করত। তা ছাড়া ঐসময়ে প্যারিসে রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা হত তিনি তা শুনতে যেতেন, আর ধীরে ধীরে সেই দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন। আইন শাস্ত্র পড়ে রইল, তিনি রসায়নশাস্ত্র আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন, আর মৌলিক গবেষণায় রত হলেন। ঠিক এই রকমটি আমরা ঘটতে দেখেছি আমাদের দেশের পদার্থবিজ্ঞানী রমনের জীবনে।

তাঁর বয়স যখন বাইশ বছর তখন ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমি লাভোয়াসিয়ারকে একটি স্বর্ণ পদক প্রদান করলেন একটি কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য। প্যারিসের রাস্তাঘাট কত সুন্দরভাবে আলোকিত করা যেতে পারে সেজন্য আকাদেমির পক্ষ থেকে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। অনেকেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

লাভোয়াসিয়ারের পরিকল্পনাটি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হওয়ায় তিনি স্বর্ণ পদকটি লাভ করেছিলেন। দু'বছর পরে তিনি আকাদেমির সভ্য-পদে নির্বাচিত হন। তাঁর দুটি কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন, যথা,—এক, ফ্রান্সের ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় সহায়ক হবে এমন একটি কাজ; দুই প্লাস্টার অব প্যারিস ও জিপসামের (Gypsum) সম্পর্কে রাসায়নিক গবেষণা।

এই সময়কার বিশিষ্ট রসায়নবিদ জোসেফ প্রিস্টলি (১৭৩৩—১৮৫৪) বায়ু থেকে একটা গ্যাস বের করেন, এখন আমরা যাকে অক্সিজেন বলে জানি। এই অক্সিজেনকে বলা হয় জীবন ধারণকারী গ্যাস। তিনি বললেন, ওটা ফ্লজিস্টন বর্জিত বায়ু। প্রিস্টলি লক্ষ্য করলেন যে সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই রকমের বায়ু মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে বিশেষ কার্যকর, আর একথাও বললেন যে ফুসফুসের অসুখে এ গ্যাস বিশেষ উপকারী হবে। প্রিস্টলি প্যারিসে এসে তাঁর আবিষ্কারের কথা লাভোয়াসিয়ারকে জানালেন, আর দেখালেন যে ঐ গ্যাসে মোমবাতি খুব বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে।

লাভোয়াসিয়ার অন্যভাবে ঐ পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। প্রিস্টলি দেখিয়েছিলেন যে পারদকে (Mercury) খুব বেশি গরম করলে তা এক রকমের লাল গুঁড়াতে পরিণত হয়, আর সেই গুঁড়াকে গরম করলে ফ্লজিস্টন বিহীন বায়ু নির্গত হয়। লাভোয়াসিয়ার প্রিস্টলির পরীক্ষা মেনে নিলেন, আর প্রিস্টলি যে গ্যাসকে ফ্লজিস্টনবিহীন বায়ু বলেছিলেন তিনি তার নাম দিলেন অক্সিজেন। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করে তিনি দেখলেন যে পরীক্ষা শেষে ঐ লাল গুঁড়ার ওজন কিছুটা কমল, আর যতটা কমল ঠিক সেই ওজনের অক্সিজেন বেরুল। এবার তিনি ঐ লাল গুঁড়া সম্বন্ধে পরীক্ষায় এলেন। আবদ্ধ বায়ুতে পারদ গরম করে ঐ লাল গুঁড়া পেলেন। লাভোয়াসিয়ার দেখলেন যে পারদের ওজন যতটা বাড়ল, বায়ুর ওজন ঠিক সেই পরিমাণে কমল।

এইসব পরীক্ষা থেকে তিনি দহন (Combustion) সম্বন্ধে এক নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। কোন ধাতুকে গরম করলে তা ওজনে বাড়ে। লাভোয়াসিয়ার বললেন, এর একমাত্র কারণ হল, উত্তপ্ত অবস্থায় ঐ ধাতু বায়ুর কিছুটা অক্সিজেন নিয়ে নেয়, রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। ফ্লজিস্টন তত্ত্ব একেবারে পরিত্যক্ত হল, রসায়নবিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর।

রাজতন্ত্রী মানুষ ছিলেন তিনি। ফরাসী রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে তিনি একটি উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই পদটির নাম Fermier General.—প্রধান ট্যাক্স কালেক্টর। এই চাকরিটা তাঁর জীবনে সুখ ও দুঃখ দুইই এনে দিয়েছিল। পদমর্যাদা ও উচ্চ বেতন ব্যতিরেকে, প্রচুর অবসর ছিল এই চাকরিতে তাঁর গবেষণার জন্য তিনি যথেষ্ট সময় পেতেন। এইটাই ছিল সুখের বিষয় এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল আটাশ। দীর্ঘ দেহী, প্রিয়দর্শন বিজ্ঞানী এক সুন্দরী চতুর্দশীর প্রেমে পড়লেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেই বিদুষী রূপসী মেরিয়্যান পলসে লাভোয়াসিয়ারের জীবনে এলেন তাঁর জীবন সঙ্গীনী হয়ে। চাকরিটা দুঃখের হয়েছিল এই কারণে যে, পরবর্ত্তীকালে বিপ্লবীদের হাতে তাঁকে জীবন দিতে হয়েছিল।

মেরি শুধু স্ত্রী ছিলেন না। তিনি তাঁর স্বামীর গবেষণা কাজেও সহায়ক হয়েছিলেন; তিনি ইংরেজী ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেছিলেন তিনি তাঁর স্বামীর জন্য প্রিস্টলি ও ক্যাভেণ্ডিসের গবেষণালব্ধ তথ্য অনুবাদ করতেন এবং তখনকার ইংলণ্ডের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা-লব্ধ তথ্যাদি অনুবাদ করে দিতেন। তাঁর জন্যই লাভোয়াসিয়ারের ভবনে ফ্রান্স ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের আসাযাওয়া ঘটত। কারাগারে বসে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বিজ্ঞানী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Memories de Chimie রচনা করেন। পরে মেরি এটি সম্পাদনা করে, প্রকাশ করেন।

শ্বাস নেবার সময় বায়ুর কি পরিবর্ত্তন ঘটে সে সম্বন্ধে

লাভোয়াসিয়ার বিবিধ পরীক্ষা করলেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এখানেও দহন ক্রিয়া চলেছে। শরীর নিচ্ছে অক্সিজেন, ত্যাগ করছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। তিনি যখন শুনলেন যে ফরাসী রাসায়নিক হেনরি ক্যাভেণ্ডিস (১৭৩১-১৮১০) দুরকমের গ্যাস মিশিয়ে জল তৈরি করেছেন, তখনি তিনি এক পরীক্ষার উদ্যোগ করলেন। জল বিশ্লেষণ করে সেই দুরকমের গ্যাস পাওয়া যায় কিনা। তিনি খুব বেশি রকম উত্তপ্ত একটি লোহার উপর দিয়ে বাষ্প পাঠালেন, লোহা জলের অক্সিজেন নিয়ে নিল, অন্য দিকে আর একটা গ্যাস জমা হতে লাগল। লাভোয়াসিয়ার এই গ্যাসের নাম দিলেন হাইড্রোজেন। তিনি দেখলেন যে, এই হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জ্বলে।

বিবিধ পরীক্ষা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নতুন কিছুরই সৃষ্টি হয় না। একদিকে যেটুকু যায় অন্যদিকে সেটুকু আসে। বিজ্ঞান যে কয়টি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, পদার্থের নিত্যতা সম্বন্ধে লাভোয়াসিয়ারের এই সিদ্ধান্ত তার অন্যতম। অনেকের বিবেচনায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। 'Nothing can be lost, nothing can be created'—তাঁর এই সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানকালের যাবতীয় রাসায়নিক সূত্র। কত বিষয়ে তিনি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না। একবার তিনি বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মধ্যে একখণ্ড হীরক পুড়িয়ে পেয়েছিলেন কার্বন ডাই-অক্সাইড। এর থেকে প্রমাণিত হলো যে রসায়নের কাছে কয়লা আর হীরে একই পদার্থ—উভয়ই কার্বন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের তুল্য এই বিজ্ঞানীর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। ১৭৮৯ সালে লাভোয়াসিয়ার ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় জাতীয় পরিষদে মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্টটি দাখিল করেছিলেন তা ঐ বিষয়ের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে আজো স্বীকৃত হয়। ১৭৯১ সালে ফরাসী প্রজাতন্ত্র তাঁর

'On the land wealth of France' বইটির পুনমুর্দ্রণ করেছিল। জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতি নিয়েও তিনি চিন্তা-ভাবনা করতেন।

কিন্তু বিপ্লবী ফ্রান্সের কাছে তাঁর প্রতিভা রেহাই পায়নি। তিনি অভিযুক্ত হলেন, তাঁর প্রতি ফাঁসির দণ্ড হল। বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি এই কথা জানালেন যে রাষ্ট্রে বিজ্ঞানীর কোন প্রয়োজন নেই। লাভোয়াসিয়ার প্রাণ দিলেন। তাঁর পরও মানুষ মানুষের মধ্যে অনেক মারামারি কাটাকাটি চলে এসেছে, সে সবের মূলে ছিল, কোথাও জাতিগত বিরোধ, কোথাও ধর্মগত দ্বন্দ্ব। কিন্তু আর একথা কারো মনে আসেনি যে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কোন স্থান নেই। বরং বর্তমান যুগে এইটাই দেখা যাচ্ছে যে, যে-দেশ বিজ্ঞানকে বেশি করে আয়ত্তের মধ্যে আনছে, যুদ্ধে বিজয়ীর জয়মাল্য তারই গলায় এসে পড়ছে।

হম্ফ্রি ডেভি

(১৭৭৮-১৮২৯)

'If the Nation could purchase a potential watt, Davy, or a Faraday at the cost of a hundred thousand pounds, it would be dirt cheap'

প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস হক্সলি এই উক্তিটি করেছিলেন এই শতাব্দীর সূচনায়। সরকারী সাহায্যে বিজ্ঞানীদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা একটি আবশ্যিক কাজ—এই কথাটাই তিনি সেদিন বিশেষভাবে বলতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কাউন্ট রুমফোর্ড ইংলণ্ডে দি রয়াল ইনস্টীটিউশন নামে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন সেখানে অধ্যাপনার কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন ডেভি ও তাঁর সহকারী ফ্যারাডে। এই প্রতিষ্ঠানটির একটি উদ্দেশ্য ছিল তরুণ বিজ্ঞানীদের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা। আজও এখানে উদীয়মান বিজ্ঞানীদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর বড়দিনের সময় ছোট ছোট ছেলেদের উপযোগী বক্তৃতামালার ব্যবস্থা আছে। হয়ত এদের ভেতর থেকে ভবিষ্যতে বেরুতে পারে একজন ওয়াট, একজন ডেভি অথবা একজন ফ্যারাডে।

প্রতিভার জন্ম কিভাবে এবং কোন পরিবেশের মধ্যে হয়, সেটা বলা শক্ত। ইংলণ্ডের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অখ্যাত স্থানে এক দরিদ্র কাঠখোদাই মিস্ত্রীর ঘরে ১৭৭৮ সালের ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হম্ফি ডেভি। বড় লোকের ঘরে জন্মান নি, আর স্কুলেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাননি তিনি। বিজ্ঞানচর্চ্চায় কোন আগ্রহই দেখা যায়নি তার মধ্যে। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা শেষ করে তিনি এক ঔষধ

নির্মাতার অধীনে শিক্ষানবিশী করেন। ভদ্রলোকের ছিল একটি বিরাট গ্রন্থাগার, ডেভি, তাঁর কাজের অবসরে সেইখানে প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন নিজের চেষ্টায়। যেসব বইতে রাসায়নিক পরীক্ষার (Experiment) বিবরণ থাকত, ডেভি বেছে বেছে সেইসব বই পড়তেন। উইলিয়াম নিকোলসন কিভাবে তড়িৎ-এর সাহায্যে জল থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করেছিলেন আর বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ লাভোয়াসিয়ার কি কি গবেষণা করেছিলেন। তিনি সেইসব পাঠ করে, রসায়নচর্চ্চাকেই তাঁর জীবনের সাধনা বলে গ্রহণ করেছিলেন। উত্তরকালে ডেভির সফলতার কথা উল্লেখ করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে লেখা হয়েছিল: 'Humphry Davy discovered more elements than any other Chemist.' এ বড়ো কম প্রশংসার কথা নয়।

খুব অল্প বয়সেই ডেভি পিতৃহীন হয়েছিলেন। তিনি উপার্জনের চেষ্টায় বেরুলেন। শেষে একজন বিজ্ঞানীর সহকারীরূপে নিযুক্ত হলেন। এই বিজ্ঞানী নানা রকম গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, গ্যাসের সাহায্যে অসুখ সারান যায় কিনা। তাঁর অধীনে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ডেভি নিজের হাতে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, কোন গ্যাস দিয়ে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা উপশম করা যেতে পারে কি? প্রথম প্রথম পরীক্ষা নিজের উপরই চলতে থাকে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বিজ্ঞানীরা নাইট্রিক অক্সাইডকে একটা বিষ গ্যাস বলে মনে করতেন। ডেভি সাহস করে সেই গ্যাস শুঁকলেন, দেখলেন, শুঁকতে বেশ ভালই লাগে। তিনি এর নাম দিলেন লাফিং (Laughing) গ্যাস। এ ঘটনা ১৭৯৯ সালের।

এই আবিষ্কারে ডেভির নাম ছড়িয়ে পড়ল, নব প্রতিষ্ঠিত রয়াল ইন্স্টিটিউশনে তিনি নিযুক্ত হলেন। তাঁর বক্তৃতা এত চিত্তাকর্ষক হতে লাগল যে শুধু বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, সাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি, রাজনীতিজ্ঞ, সকল শ্রেণীর লোক তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে

পড়ল। তখন তিনি প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার জেমস্ ওয়াটের পুত্র, জুনিয়ার ওয়াটের সংস্পর্শে এলেন। তিনি রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ডক্টর গিলবার্টের সঙ্গে ডেভির পরিচয় করিয়ে দিলেন। রসায়নে ডেভির অদ্ভুত প্রতিভা দেখে গিলবার্ট মুগ্ধ হলেন। তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল নিউমেটিক ইনস্টিটিউশনের সভাপতির কাছে ডেভির নাম সুপারিশ করে পাঠালেন। বহুবিধ গ্যাসের ভেষজ গুণাবলী পরীক্ষা করে দেখার জন্য এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছিল। বিজ্ঞান জগতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সেই প্রথম। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ডেভির উপর অর্পিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। এত কম বয়সে এমন দায়িত্বপূর্ণ পদে এর আগে বা পরে কোন বিজ্ঞানীকে দেখা যায় নি। এইটি ছিল তাঁর প্রতিভার প্রথম পুরস্কার।

তাঁর উদ্ভাবিত নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস, ডেভি বলেছিলেন, ছোট-খাটো অস্ত্রোপচারে খুব সহায়ক হবে, কিন্তু ১৮৪৪ সালের আগে এই গ্যাস কোন শল্যচিকিৎসক প্রয়োগ করেন নি। ঐ বছরে হোরেস ওয়েলস নামে এক মার্কিন দন্তচিকিৎসক নিজের উপর এই গ্যাস প্রয়োগ করে সুফল পেলেন—এই গ্যাসের সাহায্যেই তিনি নিজের একটি দাঁত তুলিয়েছিলেন। যন্ত্রণাহীন সেই উৎপাটনে তিনি নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাপের প্রকৃতি কি, সে সম্বন্ধে কাউণ্ট রুমফোর্ড অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে ডেভির পরীক্ষা আলোকপাত করল। তিনি দুখানা ধাতুর পাত ঘষে দেখালেন, তার থেকে তাপের উদ্ভব হল। এই ধরনের এক পরীক্ষায় তিনি বিনা আগুনে জল ফোটালেন, লোকে অবাক হয়ে গেল।

তখন সবে মাত্র তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে পরীক্ষা চলছিল। রয়াল ইনস্টিটিউশনে একটা বড় ব্যাটারি তৈরি হয়েছে, ডেভি তা দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ব্যাটারির দুই প্রান্তে দুটি তার যোগ করে তারের মুখ দুটি একবার ঠেকিয়ে অল্প একটু ফাঁক করে দিলেন। বৈদ্যুতিক

আলো জ্বলতে রইল। মানুষ চিরদিন আকাশে বিদ্যুতের আলো দেখে এসেছে। মানুষের তৈরি বৈদ্যুতিক আলো এই প্রথম সে দেখল। এখন রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন কোন পরীক্ষায় ডেভি তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহার করতে লাগলেন। জলের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালেন। জল ভেঙে গিয়ে তার দুই উপাদান—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বের হল। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে তিনি তাদের বিশ্লেষণ করলেন। আজ তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতি ধাতু বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া যাচ্ছে, এক ধাতুর উপর আর এক ধাতুর প্রলেপ ধরান হচ্ছে। এসবের মূলে আছে ডেভির এই পরীক্ষা। সোডার মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন সোডিয়াম ধাতু। কথিত আছে, এই আবিষ্কারের আনন্দে অধীর হয়ে তিনি ঘরের মধ্যে নৃত্য আরম্ভ করেছিলেন।

আজ যে আমরা শাকসব্জীর চাষে রাসায়নিক সার বা fertiliser ব্যবহার করি, ডেভি ছিলেন এর পুরোধা। রয়াল ইনষ্টিটিউশনের কৃষি বোর্ডের অনুরোধে তিনি এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং কৃষি রসায়ন সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তাঁর সেইসব বক্তৃতা থেকে চাষবাসের উন্নতিকল্পে বহুবিধ ইঙ্গিত পেয়ে ইংলণ্ডের চাষীরা তাদের শাকসব্জীর উৎপাদন বিস্ময়জনক ভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সময় ডেভি আর একটি কাজ করেছিলেন। প্রতি বছর বড়দিনের সময় তিনি ছোট ছোট ছেলেদের কাছে সহজ সরল ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করতেন। শৈশবকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের যদি বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা হয় তাহলে দেখা যাবে উত্তরকালে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়—ডেভির এই কথা আজো তার মূল্য হারায়নি।

সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী বলে এখন ডেভির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তড়িৎ-রসায়নের (Electro chemistry) প্রবর্তক হিসাবে

বিজ্ঞানী সমাজে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করছেন, আর তা দেখবার জন্য বিপুল লোকসমাগম হচ্ছে। তিনি রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হলেন, ফ্রান্স তাঁকে একটি বহুমূল্য স্বর্ণপদক পাঠিয়ে দিল। অথচ এই সময় ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলছে। এই পদক পেয়ে ডেভি বলেছিলেন, আমাদের দুই দেশ যুধ্যমান বটে, কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এখন ডেভি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ আলোচনা করবার জন্য বের হলেন, সঙ্গে নিলেন তাঁর নব নিযুক্ত সহকারী মাইকেল ফ্যারাডেকে। তাঁর বয়স তখন ত্রিশ বছর।

ইলেক্ট্রো-কেমিস্ট্রিতে ডেভির অবিস্মরণীয় দান হল Arc light—যা তিনি ১৮০৯ সালে রয়াল ইনস্টিটিউশনে প্রদর্শন করে সবাইকে বিস্মিত করেছিলেন। এর আগে মানুষের তৈরি এমন উজ্জ্বল আলো বা Illumination কখন দেখা যায়নি। কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্প জগৎ এর জন্য তখন প্রস্তুত ছিল না। কারণ আর্ক ল্যাম্পের জন্য যে বৈদ্যুতিক জেনারেটর প্রয়োজন তা তখনো পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নি।

১৮১২ সালটি ডেভির জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে দুটি কারণে; প্রথম—মাইকেল ফ্যারাডে নামে একুশ বছর বয়স্ক এক তরুণ এলেন তাঁর কাছে; যুবকটির হাতে এক তাড়া কাগজ। সেগুলি দিলেন তিনি ডেভির হাতে। ডেভি তো অবাক। এ যে তাঁরই বক্তৃতামালা; ডেভির বক্তৃতা শুনে সেগুলি ফ্যারাডে অবিকল লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তরুণকে তিনি তাঁর সহকারী হিসেবে গ্রহণ করলেন, কারণ ডেভি বুঝেছিলেন তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা রয়েছে। তাঁর এই অনুমান মিথ্যা ছিল না। উত্তরকালে এই ফ্যারাডে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সারিতে তাঁর স্থান করে নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ—ঐ বছরে ডেভি 'নাইট' (Knight) উপাধি লাভ করেন। দরিদ্র পিতার সন্তান, স্বয়ংশিক্ষিত হম্ফ্রি ডেভি আপন

প্রতিভাবলে হলেন স্যার হম্ফ্রি ডেভি। পরের বছর তিনি বিত্তশালী বিধবার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর ভ্রমণের সঙ্গিনী হয়েছিলেন তিনি। প্রধানত তিনি দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানের পীঠস্থানগুলি দর্শন করেন ও ঐ সব দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার বিনিময় হতে থাকে। জেনোয়াতে ইলেকট্রিক আর্ক ল্যাম্পের সাহায্যে এক খণ্ড হীরক পুড়িয়ে তিনি প্রমাণ করেন হীরক বিশুদ্ধ কার্বন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুইডেনে তিনি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক বেরজিলিয়সের সঙ্গে ক্লোরিন নিয়ে আলোচনা করেন। ডেভি বললেন, ক্লোরিণ একটি মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ নয়। এতকাল ক্লোরিন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ঠিক বিপরীত ধারণা ছিল। বেরজিলিয়স বুঝলে ডেভির সিদ্ধান্তই ঠিক। জার্মাণীতে তাঁদের ভ্রমণ শেষ হল।

১৮১৫ সালে ফিরে এলেন তিনি ইংলণ্ডে। ফিরে এসেই এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলেন। নিউক্যাসলের কয়লা খনিগুলিতে এই সময় মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটত, অনেক লোক মারা যেত। এর কারণ হল, খনিতে স্থানে স্থানে দাহ্য গ্যাস জমত। খনির কর্মীরা তার কাছে আলো আনলে উত্তাপে গ্যাস হঠাৎ জ্বলে যেত। ডেভি ফিরে আসার পর খনির মালিকরা এর প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য স্যর হম্ফ্রি ডেভিকে ধরে বসলেন। তিনি এসম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে। অল্পদিনের মধ্যে এর প্রতিবিধানের এক সহজ উপায় উদ্ভাবন করলেন তিনি। উপায়টা বিশেষ কিছু নয়, তিনি একটা ল্যাম্প তৈরি করলেন যার চিমনি সাধারণ কাচের চিমনি নয়, তামার তারের জালতি দিয়ে প্রস্তুত। এতে তাপ এক স্থানে জমা না হয়ে সমস্ত চিমনিতে ছড়িয়ে পড়ত, কাজে কাজেই উষ্ণতা বেড়ে যেত না। ফলে খনির মধ্যে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা দূর হল। এখন থেকে ডেভির সেফ্টি ল্যাম্প সমস্ত কয়লার খনিতে ব্যবহৃত হতে লাগল, অনেক কর্মী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

তাঁর এক বন্ধু এই আলোর পেটেণ্ট নেবার জন্য বললেন। এতে ডেভি অনেক টাকা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না, বললেন, এদিয়ে যে আমি অনেক জীবন রক্ষা করতে পেরেছি সেই আমার বড় পুরস্কার। আর কিছু নয়, শুধু সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কারের জন্য ডেভি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে। ১৮২৬ সালে পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। বৈদ্যুতিক রসায়নের জনক ও ছয়টি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করে ডেভি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানিদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হয়েছেন।

মাইকেল ফ্যারাডে

(১৭৯১-১৮৬৭)

'আমার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হল মাইকেল ফ্যারাডে'। এই কথা বলতেন হম্ফি ডেভি এবং বলবার সময় বেশ গর্ববোধ করতেন তিনি।

ব্যাটারি থেকে আমরা তড়িৎপ্রবাহ পাই। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ পাবার এইটেই যদি একমাত্র উপায় রয়ে যেত তবে মানবসভ্যতা আজ অনেক পিছনে পড়ে থাকত। যে প্রচণ্ড তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে ট্রেন ট্রাম চালান হয়, পাখা ঘোরান হয়, একটা গোটা শহরকে আলোকিত করা হয়, বড় বড় ওজন তোলা হয় তার উদ্ভব হচ্ছে অন্য উপায়ে। সে পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন মাইকেল ফ্যারাডে, উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষক।

১৭৯১, ২২ সেপ্টেম্বর, লণ্ডনের এক শহরতলীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাইকেল ফ্যারাডে। জন্মেছিলেন তিনি এক দরিদ্র কামারের ঘরে মা ছিলেন এক চাষীর কন্যা। স্কুলে লেখাপড়া তিনি সামান্যই শিখেছিলেন ; সবেমাত্র লিখতে পড়তে শিখেছেন এবং একটু অঙ্ক কষতে শিখেছেন, তখন তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। তাঁর বয়স তখন তেরো বছর ; সেই বয়সে একজন পুস্তকবিক্রেতার দোকানে চাকরি নিয়ে খবরের কাগজ ফিরি করতে থাকেন। বালকের কাজে খুশি হয়ে দোকানের মালিক তাঁকে পাকাপাকিভাবে বই বাঁধাইয়ের চাকরিতে বহাল করলেন। তাঁর শৈশবজীবনের প্রসঙ্গে ফ্যারাডে লিখেছেন ঃ 'জন্মগ্রহণ করে আমি এই পৃথিবীকে একটি সুখের স্থান বলে লাভ করিনি। যখন আমার বয়স দশ তখন আমাদের পরিবার

দারিদ্র্যের চরণতলে এসে পৌঁছয়, সাধারণ দরিদ্র ভাণ্ডার থেকে আমাদের খোরাক চেয়ে আনতে হত, আর আমার ভাগে ছিল সপ্তাহে মাত্র একখানা রুটি। কদর্য ঘরে আমরা বাস করতাম, আর তা এত ছোট যে বাড়ির সকলের তাতে সংকুলান হত না, কাউকে কাউকে লণ্ডন শহরের রাস্তায় রাত্রি যাপন করতে হত। কী অসহনীয় ছিল আমার শৈশবের সেই দিনগুলি।

তের বছর বয়সে মাইকেল কাজে নিযুক্ত হলেন। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জুতা পরিষ্কার করা, খবরের কাগজ ও চিঠিপত্র বিলি করা— পুরো একটি বছর এই কাজ করার পর তাঁকে বই বাঁধাই-এর কাজ শেখান হল। একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিল এই কাজ। এখন মাইকেল অনেক রকম বই-এর সংস্পর্শে এলেন, বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পড়বার সুযোগ পেলেন। পড়লেন ওআটের Improvement of the Mind, মারসেটের 'conversation on Chemistry' তড়িৎ সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক জগদ্বিখ্যাত কোষগ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর চিত্ত পিপাসিত হল। বেতন ছিল অতি সামান্য। কিন্তু তার থেকেও কিছু কিছু জমিয়ে টিকিট কিনে পদার্থবিদ্যার বক্তৃতা শুনতে যেতেন। যে-বক্তৃতা শোনেন তার সারাংশ লিপিবদ্ধ করে রাখেন, শেষে সেগুলি পুস্তাকাকারে বেঁধে নিলেন। এই রকম চারখণ্ড পুস্তক হল।

তারপর এক শুভ মুহূর্ত দেখা দিল। দোকানের একজন খরিদ্দার বিজ্ঞান সম্বন্ধে বালকের অনুসন্ধিৎসা দেখে তাকে রয়াল ইনস্টিটিউশনে চারটি বক্তৃতা শোনবার টিকিট কিনে দিলেন। এই বক্তৃতা দেবেন কে? তখনকার দিনের দেশবিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বাগ্মী স্যর হম্ফ্রি ডেভি। ডেভির মর্মস্পর্শী বক্তৃতা ফ্যারাডেকে অভিভূত করল, তিনি সেগুলির তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করে নিয়ে বাড়িতে এসে বিস্তারিত ভাবে লিখে ফেললেন, যথাযথ স্থানে চিত্র সংযোজন করলেন, তারপর সেগুলিকে বই-এর আকারে বেঁধে নিলেন।

এখন তাঁর আকাংখা হল দপ্তরীর কাজ ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞানের সেবা করা, সেজন্য তাঁকে রয়াল ইনস্টিটিউশনের একজন কর্মী হতে হবে, তা যে কোন কাজ তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্তু দপ্তরীর কারখানার শিক্ষানবিশ একটি অশিক্ষিত ছেলের আবেদন রয়াল ইনস্টিটিউশনের কর্তাদের কাছে পৌঁছবে কি করে? মাইকেল তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির কাছে পাঠালেন একটি আবেদনপত্র। দিন যায়, উত্তরের প্রতীক্ষায় আছেন তিনি। কিন্তু কোন উত্তর এল না। নিরুপায় ও মুহ্যমান বালক তখন সোজাসুজি ডেভিকে লিখলেন, ডেভির বক্তৃতার সারাংশ যে বাঁধান খাতায় লেখা ছিল সঙ্গে সেই খাতাখানাও পাঠালেন।

এর পরের ঘটনাটি রীতিমত চমকপ্রদ। একদিন ফ্যারাডের স্যাৎসেতে ভাঙা বাড়ির সামনে এক জুড়ি গাড়ী এসে থামল। তকমা-আঁটা এক চাপরাশি গাড়ি থেকে নেমে ফ্যারাডের হাতে একটি চিঠি দিল। ফ্যারাডের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ১৮১৩ সালে, বাইশ বছর বয়সে মাইকেল ফ্যারাডে রয়াল ইনস্টিটিউশনে একজন সহকারী-রূপে নিযুক্ত হলেন, বেতন হল সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং। ডেভির এই গুণগ্রাহিতার জন্য আজ সমগ্র পৃথিবী তাঁর কাছে ঋণী। যে প্রতিভা উত্তরকালে সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করেছিল তা চিরদিন অপরিস্ফুট থাকত যদি না ডেভি তার সম্যক বিকাশের সুযোগ দিতেন।

ফ্যারাডে যখন রয়াল ইনস্টিটিউশনে যোগ দিলেন তখন কলেজ তো দূরের কথা স্কুলের পুরো শিক্ষাও তিনি পাননি। একেবারে গোড়া থেকে তাঁকে আরম্ভ করতে হল। ঐ সময় ডেভির নাম বৈজ্ঞানিক জগতে ব্যস্ত। তিনি যখন ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র পরিদর্শন করতে যাত্রা করলেন, সঙ্গে নিলেন ফ্যারাডেকে। এ ভ্রমণে ফ্যারাডের ক্লেশের অবধি ছিল না, কারণ তাঁকে ডেভির চাকরের কাজও করতে হত, কিন্তু অন্যদিকে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হলেন। ঐসব দেশে যেসব বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক গবেষণার

কাজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি তাঁদের সংস্পর্শে এলেন, পরিচিত হলেন তাঁদের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে। গুরু ও শিষ্য—ডেভি ও ফ্যারাডে—দুজনেই ছিলেন আত্মশিক্ষিত বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর দুটি নেই।

স্বদেশে ফিরে এসে ফ্যারাডে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করলেন। প্রথম দিকে তাঁর অনুসন্ধান ছিল রসায়নবিদ্যা সম্পর্কীয় কয়েকটি বিষয়ে। কার্বন ও ক্লোরিন ঘটিত দুটি যৌগিক পদার্থ বের করলেন, এর একটি আজো আগুন নেবানর কাজে ব্যবহৃত হয়। এরপর একটির পর একটি তাঁর আবিষ্কার প্রকাশিত হতে থাকল। তড়িৎ প্রবাহের ফলে যখন রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে তখন কতটা পরিমাণ পদার্থ বের হয়ে আসে সে সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করলেন। ১৮২৪ সালে, দপ্তরীর কারখানায় শিক্ষানবিশ হয়ে যিনি জীবন আরম্ভ করেছিলেন, তিনি রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হলেন, আর পরের বছর, ডেভি অবসর গ্রহণ করলে, তিনি ওখানকার ল্যাবোরেটরির পরিচালকরূপে মনোনীত হলেন।

একবার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, কিন্তু ফ্যারাডে ঐ পদ গ্রহণ করলেন না, কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে-প্রতিষ্ঠানে এই দীর্ঘকাল তার পক্ষপুটে স্থান দিয়ে তাঁকে কাজের সুবিধা দিয়ে চলেছে, অধিক বেতন বা মর্যাদার লোভে, আজ তিনি সেই প্রতিষ্ঠানকে ত্যাগ করতে পারেন না। ফ্যারাডের এই মহত্ত্ব বিজ্ঞান জগতে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন তার প্রতিভায়, তেমনি তার চরিত্রে—এই সত্যটি ফ্যারাডের জীবনে নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে এটি প্রযোজ্য। আমাদের কালে আইনস্টাইনের জীবন এর একটি দৃষ্টান্ত।

এইবার বলি তড়িৎ-চুম্বক সম্বন্ধে ফ্যারাডের যুগান্তকারী পরীক্ষার কথা। তিনি দেখালেন, একটা চুম্বক দণ্ডের উপরে যদি একটা তার

থাকে, আর ঐ তারের মধ্যে দিয়ে যদি তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তবে ঐ চুম্বকদণ্ডের চারিদিকে তারটা ঘুরতে থাকবে। ভবিষ্যৎ তড়িৎ-চুম্বক সম্বন্ধে যে পরীক্ষা তাঁকে অমর করে রেখেছে, এই পরীক্ষা ছিল তারই সূচনা। ফ্যারাডে ভাবতে লাগলেন,—তড়িৎপ্রবাহ যদি চুম্বকের একটি ক্ষেত্র তৈরি করে তবে চুম্বকের ক্ষেত্র নিশ্চয় কোন উপায়ে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করবে। এই কল্পনা—convert electricity into megnetism'—নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না, সফলতা তাঁকে দেখা দিল।

বড়দিন। রয়াল সোসাইটি ভবনে কৌতূহলী দর্শকবৃন্দের সামনে ফ্যারাডে তাঁর পরীক্ষাটা করলেন। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ফ্যারাডে-পত্নী। খুবই সদাসিধে পরীক্ষা। একটা তারের কুণ্ডলী আছে, আশে পাশে কোথাও কোন সেল নেই। কুণ্ডলীর মধ্যে ফ্যারাডে একটি চুম্বক-দণ্ড দ্রুত প্রবেশ করালেন, মুহূর্তের জন্য কুণ্ডলীর মধ্যে একটা তড়িৎপ্রবাহ চলে গেল, চুম্বকটা বার করে নিলেন আবার মুহূর্তের জন্য তড়িৎস্রোত বিপরীত দিকে গেল। উপস্থিত বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু সভায় এমন অনেক গণ্যমান্য লোক ছিলেন যাঁরা বিজ্ঞানের কোন ধার ধারতেন না ; তাই তাঁদের কাছে ফ্যারাডের এই এক্সপেরিমেন্ট মনে হয়েছিল ইন্দ্রজাল।

বক্তৃতা শেষ হল। একজন মহিলা ফ্যারাডের কাছে এসে বললেন, —পরীক্ষাটি খুব সুন্দর, কিন্তু এ মানুষের কি কাজে আসবে? বহুদিন আগে ফ্রাঙ্কলিন যখন আকাশের বিদ্যুৎ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করছিলেন তখন তাঁর এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—এ আহাম্মুকি পরীক্ষার দরকারটা কি? ফ্রাঙ্কলিন উত্তর দিলেন,—একটি শিশুতে প্রয়োজন কি, একদিন সে বড় হবে, এই না! ফ্যারাডে মহিলা কে সেই রকমই উত্তর দিলেন। গ্লাডস্টোন তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, তিনিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

—এ মানুষের কি কাজে লাগবে? প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

'হয়ত এমন দিন আসবে যখন এদিয়ে আপনি অনেক কর (tax) আদায় করতে পারবেন'। উত্তরে বলেছিলেন বিজ্ঞানী।

সেদিন আসতে খুব বেশি দেরী হলো না।

ফ্যারাডের পরীক্ষার মূল কথা নিয়ে বড় বড় ডায়নামো তৈরী হতে থাকল, আর সেই ডায়নামো চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হতে লাগল। শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহ অনেক জায়গায় বাষ্পচালিত এঞ্জিনকে হটিয়ে দিয়ে কল চালাল, বড় বড় নগর আলোকিত করল, পাখা ঘোরাল, ট্রাম ছোটাল। শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে টেলিগ্রাফ পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে সংবাদ আনল, টেলিফোনে দূরদূরান্তর থেকে মানুষ কথা বলাবলি করল। সবচেয়ে বড় কথা, শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহ না পেলে আজ রেডিও, টিভি দেখা দিত না।

তাই তো হক্সলে বলেছিলেন,—আমি ভেবেচিন্তে হিসাব করে বলছি যে, কোন দেশ যদি একজন ভাবী ওয়াট বা ডেভি বা ফ্যারাডেকে একলক্ষ পাউণ্ড দিয়ে কিনতে চায়, তবে কেনাটা খুব দাঁওতে হ'ল বলে যেন মনে করে।

তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে এই আবিষ্কারের পর ফ্যারাডের সম্মুখে দুটি পথ খোলা ছিল, একটি বিজ্ঞানের সেবা করা, অপরটি অর্থ উপার্জন করা ; আর সে অর্থের পরিমাণ বড় কম নয়, বছরে প্রায় দেড় লাখ টাকা। ফ্যারাডে প্রথমটাই বেছে নিলেন। বিজ্ঞানী চিরজীবন গরীব হয়েই রইলেন, তবে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার দিন দিন পুষ্ট করতে থাকলেন। যশের কাঙালও তিনি ছিলেন না। বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে আকাংখার বিষয়—রয়াল সোসাইটির সভাপতির পদ। এই বিদ্বদজন সভা তাঁকে দুবার সভাপতির পদে মনোনিত করতে চাইল, তিনি দুবারই বলে পাঠালেন—আমি সাদাসিধে মাইকেল ফ্যারাডে হয়েই থাকতে চাই। পরিণত বয়সে একদিন রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রেতা একটি ছেলেকে দেখে তাঁর পূর্বস্মৃতি জে

উঠল, তিনি তাঁর ভ্রাতস্পুত্রীকে বলেন,—একদিন আমিও এই কাজ করেছি।

জার্মানির বিখ্যাত বিজ্ঞানী অস্টওয়াল্ডের পরীক্ষাগারে দেশ বিদেশ থেকে অনেক ছাত্র এসে গবেষণা করত। একদিন একটি জাপানি ছাত্র অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করে,—ভবিষ্যতের প্রতিভা কি শৈশবে ধরা পড়ে?

—তুমি এ প্রশ্ন করছ কেন? বলেন অধ্যাপক।

—তাহলে সরকার গরিবের ঘর থেকে ঐসব ছেলেকে বেছে এনে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, দেশ বহুগুণ লাভবান হবে।

অধ্যাপক চিন্তিত হলেন। অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীর পূর্বজীবন অনুসন্ধান করতে থাকলেন। তিনি দেখলেন, প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, ইংরেজিতে যাকে বলে romantic ও classical। ডেভি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর; ফ্যারাডের মনীষা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর। অম্লান চিত্তে প্রাণপাত পরিশ্রম করে যাওয়ার অদম্য শক্তি ও অধ্যবসায় তিনি লাভ করেছিলেন, প্রকৃতি তাঁর উপর কৃপা বর্ষণ করেন নি, নিজের চেষ্টাতেই তিনি সব পেয়েছেন, তাঁর প্রতিভা সমভাবে দীপ্তি দিয়ে গেছে।

১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে রয়াল সোসাইটিতে যখন ফ্যারাডে তাঁর আবিষ্কারটি প্রদর্শন করেন তখন বিজ্ঞান জগতে একটি নব দিগন্ত দেখা দিল—চুম্বক তড়িৎপ্রবাহে পরিণত হল। ইচ্ছে করলে এই মুল্যবান আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়ে তিনি বিত্তবান হতে পারতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীর সকলে মানুষের জন্য—এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত ছিলেন মাইকেল ফ্যারাডে। বৈদ্যুতিক মোটর ও বৈদ্যুতিক জেনারেটরের এই উদ্ভাবক ১৮৬৭ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে মারা যান। তড়িৎ বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের পরিমাপের জন্য যে 'farad' কথাটি ব্যবহৃত হয় তারই মধ্যে অমর হয়ে আছেন ফ্যারাডে।

চার্লস ডারউইন

(১৮০৯-১৮৮২)

যীশুখ্রীস্ট জন্মাবার ছয়শত বছর আগে গ্রীক দার্শনিক থেলস্ বলেছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু উৎপত্তি হয়েছে জল থেকে। অ্যারিস্টটল মনে করতেন, মিশরের নীল নদের কাদা থেকে কুমীরের উদ্ভব হয়। এর পর বহুকাল ধরে জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বহু লোক নানা রকম আলোচনা করে গিয়েছেন। শেষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান জগৎকে চমৎকৃত করল, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, জীববিদ্যা সবকিছুতে এক বিপুল সাড়া পড়ল।

কী সেই সিদ্ধান্ত? খ্রীস্টান ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলে সৃষ্টিতত্ত্ব যেভাবে বর্ণিত আছে তা একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল 'Origin of Species' নামক ডারউইনের গ্রন্থটি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালের শেষভাগে। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সনাতন খ্রীস্টধর্মের ধারক ও বাহকগণ সেদিন রীতিমত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাঁরা এই গ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের মতবাদকে আক্রমণ করলেন। শুধু তাই নয়। বিজ্ঞানী মহলেও দেখা দিয়েছিল চাঞ্চল্য। সমগ্র ইউরোপ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল এই বইটিকে কেন্দ্র করে। ফলে সেদিন সকলের মুখে মুখে শোনা গিয়েছিল একটি মানুষের নাম—চার্লস ডারউইন।

চার্লস রবার্ট ডারউইন ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ওই একই বছরে কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে জন্মেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। ডারউইনের পিতামহ ইরাসমাস ডারউইন তৎকালীন ইংলণ্ডের একজন কৃতবিদ্য ও খ্যাতনামা ব্যক্তি

ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং একধারে ন্যাচারালিস্ট, কবি ও দার্শনিক। ডারউইনের বাবা ও তাঁর অগ্রজ দুজনেই চিকিৎসক ছিলেন। সুতরাং পরিবারের সকলেই মনে করেছিলেন, চার্লসও বড় হয়ে ঐ বৃত্তি অবলম্বন করবেন।

স্কুলে পড়া শেষ হলে, (কথিত আছে, বিদ্যালয়ে চার্লস বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি) চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি ভর্তি হলেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সেখানেও বিশেষ কিছু হলনা। অল্পকালের মধ্যে বোঝা গেল যে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে আদৌ নেই। তখন তাঁর পিতা ঠিক করলেন যে, ছেলেকে তিনি ধর্মযাজক করবেন। পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁকে কেমব্রিজে। ১৮২৭ সালে তিনি এখানকার ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হলেন। তখন ডারউইনের বয়স আঠার বছর।

বছর তিন-চার তিনি কেমব্রিজে ছাত্র হিসাবে অতিবাহিত করলেন। এইখানে হামবোল্ড প্রণীত 'Personal Narrative' বইখানা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে চার্লসের মনের গতি অন্য পথে যাবার জন্য অস্থির হয়। তিনি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হলেন ন্যাচারাল হিস্ট্রির প্রতি। একজন ন্যাচারালিস্ট হিসাবে দেশবিদেশ ভ্রমণ করে, এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁর মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। ক্রাইষ্ট কলেজেই তিনি উদ্ভিদবিদ্যার প্রখ্যাত অধ্যাপক হেনস্‌লো'র প্রিয় ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। ছাত্র হিসাবে এই অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাই শেষ পর্যন্ত ডারউইনের জীবনের দিক্‌পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল। যথাসময়ে কেমব্রিজ থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ও ডিগ্রী পেলেন। পাদরির কাজ কিন্তু তাঁর মনঃপূত হল না। কিছুকাল তিনি ভূবিদ্যা সম্পর্কে অধ্যায়ন করতে থাকেন। ছেলেবেলা থেকেই বাইরের গাছপালা জীবজন্তু সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিল। এখন ঐসব পর্যবেক্ষণে তিনি দিন কাটাতে থাকেন।

১৮৩১। জীবজন্তু ও গাছপালা পর্যবেক্ষণে তাঁর দিন কাটে

এমন সময় একদিন তিনি অধ্যাপক হেনস্‌লোর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি চিঠি পেলেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে এবং ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয়ের নেতৃত্বে 'বিগল' নামে একখানা জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে যাত্রা করবে। সেই জাহাজের জন্য উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু একজন লোক চাই। ঐ চিঠির শেষভাগে লেখা ছিল; 'Don't Put on any modest doubts or fears about your disqualific actions, for I assure you that you are the very man Captain Fitg Roy is in search of.' যে বিষয়ের অনুশীলনে চার্লস আশৈশব আনন্দবোধ করে এসেছেন, সেই বিষয়ে ব্যাপক ভাবে জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার এই সুযোগ ডারউইনের হাতে যেন স্বর্গ এনে দিল। বেতনের কথা চিঠিতে উল্লিখিত ছিল না এবং কাজটা একরকম অবৈতনিক ছিল। তিনি মনোনীত হলেন। শুনেছিলেন এই অভিযানের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

১৮৩১, ২৭ ডিসেম্বর। ডারউইন বিনা বেতনে একজন ন্যাচারালিস্ট হিসাবে অভিযানকারী ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের সঙ্গে 'বিগল' জাহাজে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকার অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন কে জানত যে এই ভ্রমণ ও ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি আশ্চর্য মতবাদ প্রকাশ করবেন যা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে খ্রীস্টান জগতের চিরাচরিত সংস্কারের মূল ধরে নাড়া দেবে আর পৃথিবীর মানুষের চিন্তায় নিয়ে আসবে একটা প্রবল আলোড়ন। তাঁর আত্ম-চরিতে ডারউইন লিখেছেন: 'আমি যখন বিবর্তন-তত্ত্ব প্রচার করি তখন এর বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্যাপ্টেন ফিজরয়।' ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, 'তখন যদি জানতাম যে, যে লোকটিকে আমার অভিযানের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম পরে তিনি এইরকম ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ উদ্ভাবন ও প্রচার করবেন তাহলে আমি কখনই তাঁকে সঙ্গে নিতাম না।'

পাঁচ বৎসর কাল ব্যাপী এই সমুদ্রযাত্রা যে ডারউইন মানসের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল এবং তাঁর পরবর্তীকালের আবিষ্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল অঞ্চল ব্যতীত ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের এই সামুদ্রিক অভিযান আরো কয়েকটি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, যথা,—গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, তাইহিতি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, তাসমানিয়া, মালদিভ দ্বীপপুঞ্জ, ও সেণ্ট হেলেনা প্রভৃতি।

পাঁচ বছর পরে ডারউইন যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি একজন পুরোদস্তুর প্রাণীতত্ত্ববিদ। বহু স্থান থেকে তিনি বহু নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। কিছুকাল কেমব্রিজে অবস্থান করার পর ১৮৩৭ সনে তিনি এলেন লণ্ডনে। সংগৃহীত নমুনাগুলি সুসংবদ্ধভাবে সাজালেন। এখন তিনি প্রকৃতির বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁর পূর্ববর্তীরা এ সম্বন্ধে শুধু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, ডারউইন প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করে আপন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলেন। লণ্ডনে এসে তাঁর ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে থাকলেন।

কিন্তু তাঁর সেসব রচনা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি কিছুমাত্র আকর্ষণ করল না। লণ্ডনে এসে তিনি পরিচিত হলেন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়ারের সঙ্গে। তাঁদের এই পরিচয় পরবর্তীকালে স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তাঁর আত্মচরিত পাঠে জানা যায় যে, এই সময় থেকেই ডারউইনের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল—তিনি অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যে নূতন চিন্তাস্রোত তখন তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে সকলের অলক্ষ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকে একটা সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞান সম্মত রূপ দিতে না পারা পর্যন্ত তিনি যেন কিছুতেই স্থির হতে পারছিলেন না। ত্রিশ বছর বয়সে ডারউইন তাঁর খুল্লতাত ভগ্নী এম্‌মা ওয়েজউডকে বিবাহ করেন। তাঁর এই পত্নীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র ও দুটি কন্যার জন্ম হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল

এম্‌মার সাহচর্য বিজ্ঞানীকে তাঁর কর্মে যে প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছিল, সে কথা ডারউইন অকপটেই স্বীকার করেছেন।

অতঃপর দীর্ঘ ষোল বৎসরকাল ধরে ডারউইন একাগ্রচিত্তে বিবর্তনতত্ত্ব ও প্রজাতির উৎপত্তি নিয়ে অনুশীলন আর অনুসন্ধান করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে, জীবের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজাতি ঠিক করা যায় না। এক প্রজাতি ধীরে ধীরে অন্য এক প্রজাতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। বললেন, প্রকৃতির রাজ্যে যত জীব জন্মায় তাদের খুব অল্প সংখকেই বেঁচে থাকে। নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে এটা বেশি সত্য। তিনি বললেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে, প্রাণী ও উদ্ভিদ এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। হাজার হাজার বছরে ঘোড়া একটি ছোট কুৎসিত লোমশ জন্তু থেকে তার বর্তমান রূপ নিয়েছে। কতক প্রজাতি পৃথিবী থেকে একেবারে অন্তর্হিত হচ্ছে। আর এক নতুন প্রজাতি দেখা দিচ্ছে।

ডারউইন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, জীবন সংগ্রামে যারা বেশি যোগ্য তারাই শেষ অবধি টিকে থাকে। প্রকৃতি ক্রমাগত যোগ্যদের বাঁচিয়ে রাখছে, কাজে কাজেই অযোগ্য থেকে যোগ্যের, যোগ্যতর থেকে যোগ্যতমের ক্রমনির্বাচন চলেছে। ডারউইন মানুষের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অনুশীলনের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বানরের ঠিক বংশধর না হলেও ঠিক ঐ জাতীয় জীব থেকে মানুষের ক্রমপরিণতি হয়েছে। একথা শুনে লজ্জা পেলেও ডারউইনের এই মত লোকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে পারেনি।

তিনি যখন গবেষণায় ব্যস্ত তখন তাঁর বন্ধু লায়াল ডারউইনকে গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। এইবার তিনি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই সময়ে একদিন সকালবেলায় মালয় থেকে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একখানি চিঠি তাঁর হাতে এসে পৌঁছল। পত্রলেখকের নাম—অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। এ নাম তাঁর পরিচিত, কারণ ওয়ালেস ছিলেন একজন প্রখ্যাত ন্যাচারালিস্ট ও অনুসন্ধানকারী।

সেই পত্রখানীর সঙ্গে একটি রচনাও ছিল। সেটি পাঠ করে ডারউইন যারপর নাই বিস্মিত হলেন, কারণ এযাবৎকাল যে বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তা করে এসেছেন, ওয়ালেসের প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি তারই একটা বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পেলেন। 'চিন্তার এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য আমি কখনো দেখিনি', পরে লিখেছিলেন ডারউইন।

তিনি যেন কিছুটা হতবুদ্ধিও হয়ে গেলেন। তা'হলে বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে আরো একজন গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনি ভাবলেন এবং তখন তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হল যে, যদি এখনই তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়টি প্রকাশ করেন তবে অসাধুতার পরিচায়ক হবে সেটা। সমস্যায় পড়লেন ডারউইন। বন্ধু লায়ালকে সব কথা জানালেন। তখন ঠিক হল যে, একটি বিদ্বদ্‌সভায় ডারউইন তাঁর এবং ওয়ালেসের প্রবন্ধ পাঠ করবেন। মালয়ে বসে ওয়ালেস যখন এই সংবাদ অবগত হলেন, তখন তিনি ডারউইনকে লিখে পাঠালেন: 'আমি এই গবেষণার ক্ষেত্রে সরে দাড়ালাম—আপনার পথ এখন মুক্ত।' ওয়ালেসের এই মহানুভবতা ডারউইনকে বিস্মিত করেছিল।

১৮৬৮, ১ জুলাই।

স্থান—লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটি।

এইখানে ডারউইন তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলেন।

একবছর পরে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। 'The Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of the Favoured Races in the Struggle for life'—এই সুদীর্ঘ নামের একটি গ্রন্থ। এত লম্বা চওড়া নামের বই পৃথিবীতে আর দুটি নেই। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর। সকাল দশটার সময় প্রকাশক তাঁর দোকানের শো কেসের মধ্যে বইটি সাজিয়ে রেখেছেন। লণ্ডনের পথচারীরা দোকানটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আকৃষ্ট হয় শোকেসে সাজান বইগুলি দেখে। এমন অদ্ভুত নামের বই তারা কখনো শোনেনি

বা দেখেনি। তারা কৌতুহলী হয়, কৌতুহল থেকে বিস্ময়। তারপর, সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেই বইয়ের দোকানে সেদিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। বেলা তিনটের মধ্যে মুদ্রিত তিন হাজার কপি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্রেতাদের চাহিদা তখনো রয়েছে সমানভাবে। প্রকাশক তাঁর জীবনে এমন আশ্চর্য ঘটনা কখনো প্রত্যক্ষ করেননি। লেখক একেবারে নতুন আর বইটি উপন্যাস নয়, নাটক নয়, রম্যরচনাও নয়, বিজ্ঞানের বই। সেই বই কিনা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল।

ডারউইনের এই বইটি অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ তথা পৃথিবীতে পরিব্যপ্ত হয়ে মানুষের চিন্তা জগতে এনে দিয়েছিল একটা তুমুল আলোড়ন। বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গেল এবং সকলের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, পৃথিবীতে একটি নূতন বৈপ্লবিক চিন্তার অভ্যুদয় হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় শুধু বিজ্ঞানী নয়, একটি প্রেমিক মনেরও পরিচয় আছে যে মন ব্যতিরেকে প্রকৃতির কোন গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা যায়না। কি গভীর অনুভূতির সঙ্গে তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়কে বুঝতে চেয়েছেন, সকলকে বোঝাতে চেয়েছেন, তা এই বইটির মধ্যে লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। পড়তে পড়তে মনে হয় বিজ্ঞানের বই পড়ছি, না কোন কাব্য পড়ছি।

'ওরিজিন অব স্পাসিজ' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এইখানেই। কয়েক বছরের মধ্যেই সভ্যজগতের প্রায় সকল ভাষাতেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হল। সেদিন ডারউইনের মতবাদের প্রথম সমর্থক ও সর্বপ্রধান প্রচারক ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানি টি. এইচ. হক্সলি। তাঁর মতবাদকে নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, তা নিরসন করার জন্য তিনি ১৮৬৮ সালে 'Variation of Animals and plants' এবং ১৮৭১ সালে 'Decent of Man' এই নামে আরো দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বই দুটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিতর্ক স্তব্ধ হয়ে যায়, বিরূপ সমালোচনার ধারা বন্ধ হয় এবং বিবর্তন তত্ত্ব (Theory

of Evoliution) ধীরে ধীরে বিজ্ঞানী সমাজে স্বীকৃত ও সমাদৃত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটু কথা বলার আছে। ডারউইনের আগে লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯) এ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। তিনিও একজন ন্যাচারালিস্ট ছিলেন। এখন এঁদের দুজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ চলল। কিছু পূর্বে মেণ্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) নামে একজন পাদরী কড়াইস্থুটি গাছ নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা করে বংশানুক্রম সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। এতদিন তা চাপা ছিল, এখন তাও দেখা দিল আর ডারউইনের সিদ্ধান্তকে তা আঘাত করল। বিভিন্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আজো অনেক অনুসন্ধান চলেছে, তবে ডারউইন তাঁর গবেষণায় নানা পথ খুলে দিয়ে গেছেন, তাছাড়া কোন পথই তিনি বন্ধ করে যাননি। ১৮৮২, ১৯ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। প্রকৃতপক্ষে ডারউইন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে নিউটন ও ডারউইনের সমাধি কাছাকাছি অবস্থিত আছে। এঁরা দুজনেই প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে প্রকৃতির মর্মকথা উপলব্ধি করে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করে যান।

উইলহেলম্ রন্টগেন

(১৮৪৫-১৯২৩)

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৯৫) ডিসেম্বরের হিমশীতল এক সন্ধ্যায় শুরু হয়েছিল বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী এক বিপ্লব। সেই সন্ধ্যায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এক জার্মান পদার্থবিদ্ উর্জবার্গের ফিজিক্যাল য়্যাণ্ড মেডিক্যাল সোসাইটিতে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন; বক্তৃতার সঙ্গে পরীক্ষাও দেখাচ্ছিলেন। এই জার্মান অধ্যাপকের নাম উইলহেলম্ কনরাড রন্টগেন। এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক হিসাবে তাঁর নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। তিনি ছায়াছবি তৈরি করতে শিখেছিলেন—এগুলি ছিল বিশেষ ধরনের ছায়াছবি। এই ছিল ফটোগ্রাফির সূচনা।

১৮৪৫, ২৭ মার্চ তারিখে রন্টগেন প্রুশিয়ার এক শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন জার্মান কৃষক, মা ওলন্দাজ। হল্যাণ্ডে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়, পরে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক রুডলফ ক্লসিয়মের অধীনে অধ্যয়ন করেন। তড়িৎ. প্রবাহ, আলো, উত্তাপ ও স্থিতিস্থাপকতা—এই চারটি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট লাভ করে, তিনি চলে এলেন জার্মানিতে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহকারীরূপে। কয়েক বছর সেখানে কাজ করার পর তিনি এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন।

এই সময় তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে ইউরোপের নানা পরীক্ষাগারে বিবিধ পরীক্ষা চলছিল। এর পুরোধা ছিলেন মাইকেল ফ্যারাডে। তরল ও কঠিন পদার্থ এবং গ্যাস—সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি

তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করেছিলেন। বায়ুশূন্য স্থান অর্থাৎ Vacuum-এর ভেতর দিয়েও তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর সময়কার ভ্যাকুয়াম পাম্পগুলি উন্নত ধরনের ছিল না বলে, এই বিষয়ে পরীক্ষা আর অধিকদূর অগ্রসর হয়নি। এরপর এলেন স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স (১৮৩২-১৯১৯)। এই ইংরেজ বিজ্ঞানী দেখালেন যে, যখন তড়িৎপ্রবাহ বায়ুভেদ করে যায় তখন অনেক বিস্ময়কর ও চমৎকার ব্যাপার ঘটে। সাধারণ অবস্থায় বায়ু তড়িৎপ্রবাহে প্রচণ্ড বাধা দেয়, কিন্তু একটা কাচের বদ্ধ পাত্র থেকে ধীরে ধীরে যদি বায়ু নিষ্কাশিত করা যায় তবে পাত্রটা নানা বর্ণের আলোতে রঞ্জিত হতে থাকে।

ক্রুক্‌স এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার পর বহু বিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষাগারে নানা পরীক্ষা করতে লাগলেন। এই রকমের এক পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন রন্‌টগেন। তিনি কাচের বাল্‌ব নিজেই তৈরি করেছিলেন, আর তা যথা সম্ভব বায়ুমুক্ত করে তার ভিতর তড়িৎমোক্ষণ পাঠাচ্ছিলেন। যে ডেস্কের উপর পরীক্ষা হচ্ছিল তাতে স্তূপাকারে বই, কাচের নল, ফটোগ্রাফি নল প্রভৃতি ছিল। সেদিন কাগজে মোড়া একটা ফটোগ্রাফি প্লেটের উপর একখানা বই ছিল, আর কতদূর পড়া হয়েছে তার চিহ্ন স্বরূপ বই-এর মধ্যে ছিল একটা চাবি। এর দু'একদিন পরে বাইরের একটা দৃশ্যের আলোকচিত্র নিতে তিনি ঐ প্লেট ব্যবহার করলেন। প্লেটটা ডেভেলপ করে দেখলেন তাতে একটা চাবির ছায়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের কেউ ঐ প্লেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে কিনা। সকলেই 'না' বলল। তখন তিনি এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি ডেস্কের উপর আগের জিনিসগুলি সাজালেন, যেভাবে সাজান ছিল ঠিক সেইভাবে। বালবের মধ্যে তড়িৎমোক্ষণ পাঠালেন, প্লেটটা ডেভেলপ করলেন, চাবির ছবি ঠিক আগের মতোই দেখা গেল।

এখন রন্টগেন নানা রকমের জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করতে থাকলেন, লক্ষ্য করলেন যে ঐ বিস্ময়কর অদৃশ্য রশ্মি বই-এর পাতা ভিন্ন আরো বহু জিনিস ভেদ করে যেতে পারে। কয়েক মাস ধরে পরীক্ষা চলল, কিন্তু তিনি ঐ অদৃশ্য রশ্মিকে দৃষ্টিগোচর করবার কোন উপায়ই খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল যে ঐ পাত্রের কাচ যখন তড়িৎমোক্ষণে দীপ্তি দেয় তখন ঐ অদৃশ্য আলোকপাতে অন্য জিনিসও ভাস্বর হতে পারে। একে একে পঞ্চাশ রকমের জিনিস নিয়ে তিনি একমনে পরীক্ষা করে গেলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল কথাই হল experiment বা পরীক্ষা। পরীক্ষার সঙ্গে প্রয়োজন ধৈর্য। পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানীর সফলতার মূলে আছে প্রধানত তিনটি জিনিস, যথা,—চিন্তাশক্তি, পরীক্ষা ও ধৈর্য।

অবশেষে রন্টগেন লক্ষ্য করলেন যে, ঐ অদৃশ্য আলো যখন বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইডের উপর পড়ে তখন ঐ জিনিসটা সব চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়। তিনি এখন একটা কার্ডবোর্ডের একদিকে একখানা কালো কাগজ আঁটলেন, আর অন্যদিকটায় মাখালেন ঐ রাসায়নিক পদার্থ বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড। তখন দেখা গেল অদৃশ্য আলো পড়লে এই দিকটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

গণিতশাস্ত্রে যেটা অজ্ঞাত থাকে তাকে এক্স (X) বলা হয়। রন্টগেন এই নতুন পাওয়া অজ্ঞাত অপরিচিতের নাম দিলেন X-ray বা এক্স রশ্মি। এর জনপ্রিয় নামটি হল 'রঞ্জন রশ্মি'। এই রশ্মি আলোর সাধারণ নিয়ম তুচ্ছ করে অনচ্ছ কালো কাগজ ভেদ করে বেরিয়ে এল। ১৮৯৫। ডিসেম্বর মাস। বিজ্ঞানজগতে একটি নতুন আবিষ্কারের বার্তা ঘোষিত হল। বিদ্যুৎবেগে এই সংবাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

এখন তিনি ভাবতে লাগলেন, ঐ রশ্মি যখন কালো কাগজ ভেদ করল তখন আর কি কি অনচ্ছ জিনিসের মধ্যে দিয়ে এটা যেতে পারে। অমনি আরম্ভ হয় অনুসন্ধান। বেরিয়াম প্ল্যাটিনো-

সায়ানাইড পর্দা আর ঐ নলের মধ্যে রন্টগেন হাজার পৃষ্ঠার একখানি বই ধরলেন, পর পর দু প্যাকেট তাস ধরলেন, রশ্মি সেসব ভেদ করে পর্দাকে উদ্দীপ্ত করল। কিন্তু তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়মের পাত্র ভেদ করে যেতে পারল না। ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের নানা পর্দা ধরে রন্টগেন লক্ষ্য করলেন যে, যার ঘনত্ব বেশি তার ভেতর দিয়ে রশ্মি সেরকম যেতে পারে না, অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের জিনিসই ভেদ করে যায়।

রন্টগেন নিজের হাত রাখলেন, দেখলেন, যেখানে হাড় রয়েছে রশ্মি সেই হাড় ভেদ করে গেল, কাজে কাজেই পর্দার উপর হাতের ভিতরকার হাড়ের ছবি স্পষ্ট আকারে দেখা গেল। জার্মানিতে যেদিন রন্টগেন এক্স-রশ্মি আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন তার তিন দিন পরে মানুষের দেহের ভিতরকার হাড়ের ছবি লণ্ডনের বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করল। এক আকস্মিক ঘটনা থেকে তিনি পদার্থবিদ্যার ও চিকিৎসাবিদ্যার নতুন নতুন প্রবেশ পথ খুলে দিলেন, যা ছিল দৃষ্টির অগোচর মানুষ এখন তা প্রত্যক্ষ করল। ঠিক এমনটি ঘটেছিল আর্কিমিডিসের জীবনে। বস্তুত এক্স-রশ্মির আবিষ্কারটা ঘটেছিল হঠাৎ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসে এরকম বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ হলেও প্রকৃতি তাঁর দরজা খুলে দেন শুধু তাঁকেই যিনি ঐ দরজায় অনবরত ঘা দিতে থাকেন।

১৮৯৬ সালটি এই বিজ্ঞানীর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য রয়াল সোসাইটি রন্টগেনকে সম্মানিত করলেন রুমফোর্ড পদক প্রদান করে। এর চার বছর পরে তাঁর ভাগ্যে আরো সম্মানলাভ ঘটল, যথা,—১৯০০ সালে মুনিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। আর পরবর্তি বৎসরে তিনি পদার্থবিদ্যায় লাভ করলেন দুর্লভ নোবেল পুরস্কার। তিনি বিশ বৎসর কাল অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কিন্তু কি এ অদৃশ্য রশ্মি, এর প্রকৃতি কি?

নিশ্চয় এ আলো নয়, কারণ এ যে অনচ্ছ পদার্থ ভেদ করে চলেছে। ঐ জাতীয় আর কিছু কি? একথার মীমাংসা আরো পরে হল। প্রমাণিত হল যে আলো যেমন ঈথর-তরঙ্গ এক্স-রশ্মিও তাই, তবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুবই ছোট, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

রন্টগেনের প্রতি পৃথিবীর মানুষের আজ কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। মানুষ এখন নানা রকমে এক্স-রশ্মিকে কাজে লাগায়। লোহার ভিতরে কোন দোষ আছে কিনা এক্স-রশ্মি ধরে দিল, আবার আবার হীরা-জহরৎ খাঁটি কিনা এই অদ্ভুত রশ্মি তা সঠিক বলে দিল। শরীরের মধ্যে কোথায় হাড় ভেঙে গেছে এক্স-রশ্মি তা দেখিয়ে দিল; আবার ডাক্তার দেখে নিলেন সরে যাওয়া হাড় তিনি ঠিক মত বসিয়েছেন কিনা। শিশু খেলা করতে করতে কি পয়সা গিলে ফেলেছে? এক্স রশ্মি তা দেখিয়ে দিল।

এইখানেই এর প্রয়োজনীয়তা শেষ নয়। মানুষের হৃদযন্ত্রের আকার অবস্থিতি এই আশ্চর্য রশ্মি চোখের সামনে ধরল। যক্ষ্মারোগে ফুসফুস আক্রান্ত কিনা। কিডনিতে পাথর আছে কিনা, এক্স-রশ্মি ফটোগ্রাফ তার সাক্ষ্য দিল। এই রশ্মি দিয়ে চলচ্চিত্রের ফিল্ম তুলে মানুষের ফুসফুস কি রকম কাজ করছে দেখা গেল। বেরিয়াম সালফেট এই রশ্মির পক্ষে অনচ্ছ। একজনকে বেরিয়াম সালফেট খাওয়ানো হল, ওটা যখন অন্ত্রের মধ্যে ঢুকল তখন এক্স-রশ্মি ফটোগ্রাফ নেওয়া হল, অন্ত্রের ছায়া পড়ল, অন্ত্রের পথ স্বাভাবিক আছে কিনা জানা গেল। বেশি ভোল্ট চালিত বাল্‌ব থেকে যে একস-রশ্মি বেরুল তা দেহের ভিতরকার ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ হল। এইভাবে এক্স-রশ্মি চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনল

১৯২৩ সালে উইলহেলম রন্টগেন পরলোক গমন করেন।

টমাস আল্‌ভা এডিসন

(১৮৪৭-১৯৩১)

উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন একটি আশ্চর্য মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছিলেন টমাস অল্‌ভা এডিসন। এই শতাব্দীর সূচনায় বিদগ্ধ সমাজে একটা প্রশ্ন উঠেছিল ঃ পৃথিবীতে কার মাথার নগদ দাম সব চেয়ে বেশি? এর একটাই সর্বাদীসম্মত উত্তর পাওয়া গিয়েছিল—এডিসনের। শিল্প-সমৃদ্ধির সেই বিস্ময়কর যুগে তাঁর অত্যাশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়াগুলি শুধু যে যান্ত্রিক পদ্ধতির দিক দিয়ে অসাধারণ ছিল তা নয়, উন্নতির নব নব ক্ষেত্রেরও দিক্ নির্দেশ করেছিল। যেমন অসামান্য ছিল তাঁর প্রতিভা তেমনি অদ্ভুত ছিল এই বিজ্ঞানীর জীবন।

১৮৪৭, ১১ ফেব্রুয়ারি, টমাস আল্‌ভা এডিসন এক দীর্ঘজীবী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রপিতামহ একশ চার বছর জীবিত ছিলেন, আর পিতামহ ও পিতা যথাক্রমে একশ দুই ও চুরানব্বই বছর বয়সে দেহত্যগ করেন। আল্‌ভা এডিসনও চুরাশি বছর পৃথিবীতে থেকে মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। উপকৃত ও কৃতজ্ঞ পৃথিবী থেকে তিনি তাঁর জীবিত কালেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

এডিসন পরিবার বিপ্লবের পূর্বেই আমেরিকায় এসেছিলেন। স্যামুয়েল এডিসন এসেছিলেন এক ওলান্দাজ বংশ থেকে। আর তাঁর পূর্বপুরুষগণ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে হল্যাণ্ড থেকে এসে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মার্কিন উপনিবেশে তাঁদের বসতি স্থাপন করেন। পরে তাঁরা কানাডায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে এডিসন পরিবারে সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন টমাস আল্‌ভা। শৈশবে তাঁর স্বাস্থ্য মোটেই

ভালো ছিল না। আরামদায়ক গৃহ আর জীবনযাত্রা খুব আড়ম্বর পূর্ণ না হলেও বেশ সচ্ছল ছিল।

টমাসের বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁদের পরিবার বর্গ মিচিগানে একটি বন্দর শহরে উঠে এসেছিলেন। শহরটির নাম পোর্ট হুরোন। এখানে তাঁদের কাঠের ব্যবসা ভালই চলতে লাগল। এখানে এডিসন পরিবার একটি নতুন সুপরিসর বাড়িতে বাস করতেন। স্কুলে তিনি বেশি দিন পড়েন নি—মোট তিন মাস ছিল তাঁর স্কুলজীবন। টমাসের মা ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। জীবনে আর কখনো তিনি স্কুলের চৌকাঠ মাড়াননি। বাড়িতে মায়ের কাছেই তিনি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। স্কুলে না গেলেও শৈশবাবধি বালকের শিক্ষার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ।

দশ এগার বছর বয়সে রসায়ন বিদ্যার চর্চায় টমাসের আগ্রহ দেখা দেয়। বাড়ির ভূগর্ভস্থ ছোট ঘরটি তিনি বাক্স ও বোতল দিয়ে সাজিয়েছিলেন। বলতেন, এটা তাঁর ল্যাবোরেটরি। কতকগুলি শিশি যোগাড় করে ডাক্তারখানা থেকে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য কিনে এনে তিনি নানা পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এর থেকেই একটি প্রতিভার সূচনা হয়েছিল। তাঁর উৎসাহ দিন দিন বাড়তে লাগল, কিন্তু বাড়ি থেকে যে সামান্য টাকা পেতেন তাতে পরীক্ষার সব জিনিস সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আরো উপকরণ, আরো বইপত্র দরকার এবং সে সব সংগ্রহ করার জন্য টাকার দরকার।

তখন কিশোর টমাস পিতামাতার অনুমতি নিয়ে নিজে অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হলেন। তের বছর বয়সে তিনি ট্রেনের যাত্রীদের কাছে খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি বিক্রি করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তিনি ফেরিওয়ালাও হলেন—ট্রেনে পোর্ট হুরোন ও ডেট্রয়েট স্টেশনের মধ্যে বাদাম, পিপারমেন্ট প্রভৃতি বিক্রি করতে থাকেন। ট্রেনে একটা গাড়ির এক অংশে তিনি কাগজপত্র রাখতেন। আর ধীরে ধীরে তাঁর পরীক্ষাগারটি এখানেই উঠিয়ে আনলেন। একদিন

তিনি সংবাদ পেলেন সস্তায় একটা ছাপাখানা বিক্রি হবে ; অমনি বেশ লাভেই সেটা কিনে নিলেন। গাড়ির সেই ঘরটিতেই ছোট একটি ছাপাখানা বসিয়ে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করতে থাকলেন। সেই কাগজের তিনিই ছিলেন স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর ও পরিবেশক। চলন্ত গাড়িতে সংবাদপত্র মুদ্রণ এই প্রথম, আর পৃথিবীতে আল্‌ভা এডিসনের চেয়ে কম বয়সে কেউ কোনদিন সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেননি।

কাগজটার নাম দিয়েছিলেন 'ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস'—এক পৃষ্ঠার কাগজ। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর গ্রাহকের সংখ্যা বেশ ভালই দাঁড়িয়েছিল। কাগজ থেকে লাভ হলো একশো ডলার। পনর বছর বয়সের একজন ছেলের পক্ষে এটা একটি ছোটখাটো সম্পদ বলে গণ্য হয়েছিল। পত্রিকা সম্পাদনা করার অবসরে ল্যাবোরেটরির কাজও চলত। একদিন রাসায়নিক পরীক্ষা করতে করতে একটা শিশি গাড়ির মেঝেতে পড়ল, আর ভিতরকার ফস্‌ফরাসে গাড়িতে আগুন ধরে গেল। ট্রেনের চালক এসেই টমাসের সমস্ত জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দিল আর এত জোরে তাঁর কান মলে দিল যে কানের যন্ত্রণা স্থায়ীভাবে রয়ে গেল।

এডিসনের জীবনের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ হল।

এবার টেলিগ্রাফের কাজ শিখবার অদম্য ইচ্ছা জাগল তাঁর মনের মধ্যে। তিনি মাউন্ট ক্লিমেন্স স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ও তার বাবুর কাছ থেকে মোর্সে সাংকেতিক লিপি (Morse code) আর সেই সঙ্গে তারবার্তা পাঠাবার মোটামুটি পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন। কিছু-দিন কাজ শিখবার পর তিনি টেলিগ্রাফ আপিসে একটা চাকরি পেলেন, দিনের বেলায় কাজ, বেতন সামান্য। এখন এডিসন ভাবলেন যে রাতেও কাজ করতে না পারলে টেলিগ্রাফিটা তিনি ভাল রকম আয়ত্ত করতে পারবেন না, কারণ রাতে খবরের কাগজের জন্য যেসব খবর তাড়াতাড়ি আসে সেগুলি ঠিকমত ধরতে পারলে তিনি কাজে

পাকা হবেন, মাইনে বাড়বে। সেখানে রাতে যে ভদ্রলোকের উপর কাজের ভার ছিল তিনি সন্ধ্যার পর ঠিক ধাতস্থ থাকতেন না। সুতরাং এডিসন যখন তাঁকে সাহায্য করবার প্রস্তাব করলেন তিনি বেঁচে গেলেন। এডিসন তাঁর সমবয়সী আর একজন উৎসাহী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাজে লেগে গেলেন, দুজনে মিলে বেশ কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে এক বিপদ ঘটল। ওদিক থেকে যে লোক টেলিগ্রাম পাঠাত সে চলে গেল, তার বদলে যে এল সে এত তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠায় যে তার তাল রাখা ছেলে দুটির পক্ষে সম্ভব হল না।

এডিসন তখন এক মতলব ঠাওরালেন।

তিনি দুটো পুরানো মোর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্র যোগাড় করলেন। মোর্সের যন্ত্র হল দূরে এক জায়গায় আঙ্গুলের চাপ দিয়ে টরে-টক্কা করে ঘা দেবে। কিশোর এডিসন একটা লম্বা কাগজের ফিতা একটা যন্ত্রে পরালেন, আর যখন সংবাদ আসে তখন কাগজখানা টানতে থাকেন। এতে করে কাগজের উপর দাগ পড়ে যায়। ভিন্ন ভিন্ন সংকেতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের দাগ পড়ে। এই কাগজখানা এবার দ্বিতীয় কলের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যান, আর টরে-টক্কা শব্দ বেরুতে থাকে। দ্বিতীয় কলে কাগজটা ইচ্ছামত আস্তে আস্তে টানায় শব্দগুলি ধীরে ধীরে বেরয়, তাড়াতাড়ি আসায় ধরতে যে অসুবিধা ছিল তা আর থাকল না। ছেলে দুটি খুব খুশি। এখন কাজ বেশ চলছে, তবে বাইরের কেউ জানে না কি করে কি হচ্ছে।

একদিন এডিসন ধরা পড়ে গেলেন। যুক্তরাজ্যে তখন সভাপতি নির্বাচনের সময়। খুব তাড়াতাড়ি চারদিক থেকে খবর আসছে, কিন্তু কিশোরদের ব্যবস্থায় সেগুলি প্রথমে কাগজে দাগ কাটবে। তারপর সেই দাগ থেকে শব্দ বের করতে হবে। এই করতে গিয়ে তাঁরা একটু পিছিয়ে পড়লেন, খবরের কাগজওয়ালারা খুব হৈ চৈ আরম্ভ করল। কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানে জানতে পারলেন এতদিন কি করে কি হচ্ছিল,

কল দুটির ব্যবহার বন্ধ হল। এডিসন কিন্তু ঐ কল দুটি রেখে দিলেন।

১৮৬৯ সালটি এডিসনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছরের একদিন সকালে এডিসন নিউইয়র্ক শহরে এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে একবেলা খাবারেরও সংস্থান নেই। সেখানকার টেলিগ্রাফ অপিসে একখানা দরখাস্ত দিলেন। যতদিন না চাকুরি পান সেখানকার ব্যাটারি ঘরে থাকবার অনুমতি পেলেন। এর তিন দিন পরে সেখানকার টেলিগ্রাফের বড় কল বিগ্‌ড়ে গেল।

আমি সব ঠিক করে দিতে পারি।

কিশোর এডিসন এগিয়ে গিয়ে প্রধান কর্মকর্তাকে বললেন এই কথা। অজ্ঞাত, অপরিচিত কিশোরের কথা শুনে সকলে অবাক হয়ে গেল, কিন্তু তখন উপায় কি, তাঁকেই ভার দেওয়া হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এডিসন সব ঠিক করে দিলেন। প্রধান কর্তা তখনই মাসিক তিনশো ডলার বেতনে এডিসনকে ওখানকার একজন পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করলেন। এই আশাতীত পদলাভে এডিসন স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু ধন ও মান তাঁকে নষ্ট করল না, এখন তিনি নিশ্চিত হয়ে নব নব উদ্ভাবনায় রত হলেন, আর অল্পদিনের মধ্যে তাঁর বিবিধ আবিষ্ক্রিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার লাভ করলেন। এখন এডিসনের বয়স মাত্র বাইশ বছর। এই টাকা দিয়ে তিনি পৃথকভাবে একটা প্রথম শ্রেণীর কারখানা খুলে টেলিগ্রাফ যন্ত্র তৈরি করতে লাগলেন। যন্ত্রের নানারকম উন্নতি হল, এমন এক যন্ত্র তৈরি হল যাতে একই সময়ে এক দিক থেকে দুটো অপরদিক থেকে অন্য দুটো বার্তা প্রেরিত হতে পারে।

দিবারাত্র কারখানায় কাজ চলতে লাগল; দিনে ও রাতে তিনি নিজেই ফোরম্যানের কাজ করতে থাকেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন তিনি। যতই কাজ বাড়ুক, ততই তিনি নিদ্রা কমিয়ে দিলেন। এই সময় তাঁর মাথায় একটির পর একটি আবিষ্ক্রিয়া ভীড় করে আসতে থাকে আর ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে সেগুলি তিনি বাস্তবে রূপায়িত

করে চলেন। ১৮৭৬ সালের মধ্যে এডিসনকে সবশুদ্ধ একশো বাইশটি পেটেণ্ট নিতে হয়েছিল। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি মেরি ষ্টিলওয়েলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইনি স্বামীর কাজে তাঁকে সহায়তা করতেন। বিবাহের ছয় বৎসর কালের মধ্যে তাঁদের একটি কন্যা ও ছুটি পুত্রের জন্ম হয়।

১৮৭৮। এডিসন নিউজার্সির অন্তর্গত মেলো পার্ক নামে একটি ছোট শহরে উঠে এলেন। এইখানে তাঁর গৃহের সন্নিকটেই খুললেন একটি কারখানা। তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা নতুন নতুন আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে সার্থক হয়ে উঠতে লাগল। তারের ভিতর দিয়ে দূরতম স্থানে মুহূর্তমধ্যে সাংকেতিক লিপি প্রেরিত হয়ে পৃথিবীতে চমকের সৃষ্টি করেছিল টেলিগ্রাফ; কিন্তু সে তো মূক বাণী। এইবারে মুখের কথাকে দূরতম স্থানে তারের ভিতর দিয়ে প্রেরণ করার কৌশল আবিষ্কার করলেন এডিসন। মানুষের কণ্ঠস্বর মুহূর্তমধ্যে দূরতম স্থানে প্রেরণের উপায় প্রথমে উদ্ভাবন করেন আলেকজান্দার গ্রেহাম বেল (১৮৪৭-১৯২১)। এরই নাম দূরভাষণ যন্ত্র। কিন্তু বেলের উদ্ভাবিত যন্ত্রটি প্রয়োগের দিক দিয়ে ততটা উন্নত ছিল না। তাঁর যন্ত্রের ক্রটি কোথায় কোথায় এডিসন লক্ষ্য করলেন। তারপর কার্বন ট্রান্সমিটার উদ্ভাবন করে টেলিফোনকে সম্পূর্ণতা প্রদান করেন। তখন থেকে এডিসন নির্মিত যন্ত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চলতে লাগল।

ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ফনোগ্রাফ (বর্তমান গ্রামোফোন রেকর্ড) আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করে দিলেন। এডিসন শৈশবে যে যন্ত্র ছুটি নিয়ে টেলিগ্রাফের শব্দ ধরতেন তা এখন আবার নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, কথা থেকে দাগ কাটা আর সেই কাটা দাগ থেকে কথা বের করা—এ সম্ভব কিনা। তিনি একটা যেমন-তেমন ব্যবস্থা করে নিলেন, একটা টান্‌টান চামড়ার গায়ে পিন লাগালেন, পিনটা একখানা মোম লাগান কাগজের গায়ে গিয়ে ঠেকল। চামড়ার সামনে এডিসন 'হুঃ' করে একটা শব্দ করলেন,

সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানা একটু টানলেন, কাগজখানায় একটা দাগ পড়ে গেল। এইবার তিনি দাগযুক্ত কাগজখানার দাগের গোড়ায় পিনটা বসিয়ে কাগজটা আবার টানলেন, আর কান পেতে রইলেন কিছু শোনা যায় কিনা। খুব মৃদু কিন্তু বেশ স্পষ্ট 'হুঃ' শব্দ শোনা গেল।

১৮৭৭, ১৮ জুলাই। সেদিন এডিসন তাঁর ডায়রিতে লিখছেন: 'একটি পর্দায় একটি পিন লাগালাম, আর পিনটা একখানা মোম মাখান কাগজে গিয়ে ঠেকল। পর্দার সামনে কথা বললাম, আর কাগজখানা সরাতে থাকলাম। পিন কাগজের উপর দাগ কেটে গেল। এখন আমার মনে হচ্ছে, এই রকম করে মানুষের গলার আওয়াজ ধরে রাখতে পারব।'

এডিসন যন্ত্রের উন্নতি করতে থাকলেন। একটা চোঙা নিলেন, তাতে রাঙতা জড়ালেন, পিনটা রাঙতার গায়ে ঠেকল। পর্দার অপর দিকে একটা বড় চোঙ বসিয়ে কথা বলার ব্যবস্থা করলেন, এতে পর্দার কম্পন জোরালো হল। চোঙটা ঘুরতে থাকল। চোঙের সামনে বিজ্ঞানী বললেন,—

Mary had a littIe lamb,
With fleece as white as snow—

রাঙতার উপর দাগ হয়ে গেল। এবার সেই দাগের উপর পিন বসিয়ে চোঙটা ঘোরালেন। কোন ভুল নেই, সেই শব্দ অবিকল বেরতে লাগল,—

Mary had a little lamb,
With fleece as white as snow—

একেবারে স্পষ্ট। পৃথিবীতে ফনোগ্রাফের সৃষ্টি হল। যন্ত্রটা এরপর এডিসন নানাভাবে ঐ যন্ত্রের উন্নতি করতে থাকলেন।

এখন তিনি বৈদ্যুতিক বাতির উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করলেন নিজেকে। এতদিন বৈদ্যুতিক বাতিতে প্লাটিনাম তার ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, তাতে অসুবিধা ছিল এই যে তারটা যখন খুব গরম হয়ে

উঠত তখন সেটা গলে যেত। বাতির মধ্যে থেকে বায়ু বের করে নিয়ে কার্বন তন্তু ব্যবহার করলে সুফল হতে পারে। কিন্তু কোন রকমের তন্তু বেশি কাজের হবে এডিসন অনুসন্ধান করতে থাকলেন। নিজের দেশে উত্তর থেকে দক্ষিণ অবধি তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু কোনটাই পছন্দ হল না। লোক পাঠালেন চীনে, জাপানে, ভারতবর্ষে, সিংহলে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাঁশের তন্তু ঐ কাজে লাগালেন।

এডিসন-প্রতিভা এবার আর একটি চমকের সৃষ্টি করল। তিনি মানুষের চোখকে ধাঁধা লাগিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করলেন। লোকের মনোরঞ্জন করতে ফনোগ্রাফ ও চলচ্চিত্রের চেয়ে বিজ্ঞানের বড় দান আর কিছু নেই। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি নানা দিকে বিস্তৃত হল। মৃত্যুকালে দেখা গেল তিনি জীবনে বারো শো নতুন যন্ত্রের পেটেন্ট নিয়েছেন। মৌলিক গবেষণা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ এই দুই-এর একত্র সমাবেশ হয়েছিল এডিসনের সাধনায়।

অদ্ভুত তাঁর জীবন, বিস্ময়কর তাঁর প্রতিভা। তেমনি ছিল তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা।

বত্রিশ বছর বয়সে জাতির গৌরবের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চল্লিশ বছর বয়সে উদ্ভাবক হিসাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ব বিশ্রুত। উদ্ভাবনের ক্ষমতায়, খ্যাতিতে ও অর্থে এডিসন যেন পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের কাছে বিস্ময়ের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন কর্মঠ। ১৯৩১, ১৮ অক্টোবর তারিখে চুরাশি বছর বয়সে মানুষের পৃথিবীকে আরো বর্ণাঢ্য, আরো আরামপ্রদ করে দিয়ে এই উদ্ভাবকশ্রেষ্ঠ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

এডিসন আজ নেই। কিন্তু তাঁর উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ, টেলিফোন গ্রামোফোন ও বায়াস্কোপ এই বিজ্ঞানীর স্মৃতিকে আমাদের কাছে দেদীপ্যমান করে রেখেছে।

মেরী কুরী

(১৮৬৭-১৯৩৪)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে এক নব যুগ আরম্ভ হল। এতদিন পরমাণুকে (Atom) একটা মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল, এখন দেখা গেল তা নয়। প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে পাওয়া যায় ইলেকট্রন। একটি ইলেকট্রন অপরা (negative) তড়িৎযুক্ত, আর যে রকমের পরমাণু থেকে বেরুক না কেন, ইলেকট্রনরা হুবহু এক। একটি ইলেকট্রনের ভর (mass) ও তাতে নিবদ্ধ তড়িতের পরিমাণ নিরূপিত হল।

এর অল্প কিছুদিন আগে বেরিয়েছে এক্স-রশ্মি। রন্টগেন এই রশ্মি সৃষ্টি করবার পদ্ধতি প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে এ নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়েছে। বেকারেল আরম্ভ করলেন অনুসন্ধান, রন্টগেন উদ্ভাবিত পদ্ধতি ভিন্ন অন্য উপায়ে এক্স-রশ্মি পাওয়া যায় কি না। তিনি দেখলেন ইউরেনিয়ম থেকে আপনা আপনি এক রকমের রশ্মি বেরয়, কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফি কাচের উপর তার ক্রিয়া ঠিক এক্স-রশ্মির অনুরূপ। তবে কি ইউরেনিয়াম থেকে স্বতঃই এক্স-রশ্মি নির্গত হচ্ছে! বেকারেল প্রথমটা এই রকম মনে করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে লক্ষ্য করলেন যে ওটা এক নতুন রকমের রশ্মি, তবে ফটোগ্রাফি কাচের উপর উভয়ের ক্রিয়া সমান। এইবার এই বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন মেরী কুরী।

মেরী স্কল্‌ডোয়াস্কা কুরী ১৮৬৭ সালে পোলাণ্ডের ওয়ারস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ঐ শহরের এক স্কুলে বিজ্ঞান

ও গণিতের শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে শিক্ষককেই অনেক সময় নিজের পয়সায় বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কিনে নিতে হত। মা ছিলেন একজন প্রতিভাশালী পিয়ানোবাদিকা এবং একটি বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। মেরী ছিলেন পিতামাতার সর্ব-কনিষ্ঠ ও আদরের সন্তান। মেরি দিনের বেলায় স্কুলে যেত আর সন্ধ্যার সময় পরীক্ষাগারে এসে তার বাবাকে সাহায্য করত,—টেস্টটিউব ধুত, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করত। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন পোলাণ্ডের অধিবাসীরা রাশিয়ার জারের অত্যাচারে জর্জরিত। অসহনীয় ছিল সেই অত্যাচার। তাদের সকল রকম স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, বিদ্যালয়ে নিজেদের মাতৃভাষা ত্যাগ করে তাদের রুশ ভাষা শিখতে বাধ্য করা হয়েছিল। মাতৃভূমির ইতিহাস বর্জন করে রাশিয়ার ইতিহাস বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র পাঠ্য ছিল। এর ফলে পোলাণ্ডের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ইতিহাস ত বটেই, এমন কি নিজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলতে বসেছিল।

এই শ্বাসরোধী পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হয় মেরীর বাল্য-জীবন। স্কুল ত্যাগ করার পর তিনি কয়েক বছর নিকটবর্তী এক ধনীর সন্তানদের গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত হয়ে অল্প কিছু করে উপার্জন করতে লাগলেন। অবশেষে ১৮৯১ সালে প্যারিস অভিমুখে রওনা হলেন; নিজের কর্মশক্তি ও ধীশক্তি ছাড়া কোন সম্বল সঙ্গে রইল না। প্যারিসে সবচেয়ে দরিদ্রেরা যে অংশে বাস করত, তিনি সেখানে একটি অতি স্বল্প পরিসরের ঘরে আশ্রয় নিলেন। আহার একেবারে সাধারণ ও অপ্রচুর; ফলে শরীর জীর্ণ হতে থাকল। প্রথমে একটি রসায়নাগারে উনান ধরান, টেস্টটিউব পরিষ্কার করার কাজ নিলেন, কিন্তু কর্মপটুতায় অল্পকালের মধ্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পেলেন।

এই সময় পিরীকুরী (১৮৫৯-১৯০৬) পদার্থবিদ্যায় কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি তখন

স্বল্প বেতনে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। মেরী বিজ্ঞানের অনেক বিষয় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। ১৮৯৫ সালে তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মেরী তখন ফ্রান্সের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় কুরী দম্পতির অবস্থা এমন ছিল যে বাড়ির কাজকর্ম করবার জন্য একজনও চাকর ছিল না, অধ্যাপক কুরী ঘর ঝাঁট দিতেন, ম্যাডাম কুরী রান্না করতেন। তথাপি এই অভাবের মধ্যেও চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরীর অধ্যাপনা আর পিরী লিপ্ত থাকেন তাঁর গবেষণার কাজে।

যে বছর তাঁদের বিয়ে হল সেই বছর রন্টগেন এক্স-রশ্মি আবিষ্কার করেন, আর পরের বছর বেকারেল ইউরেনিয়ম থেকে এক্স-রশ্মির অনুরূপ তেজ লক্ষ্য করলেন। কুরী দম্পতি বেকারেলের এই গবেষণায় আকৃষ্ট হলেন, ইউরেনিয়ম ছাড়া অন্য কোন পদার্থ থেকে অনুরূপ তেজ বেরয় কিনা সে সম্বন্ধে ম্যাডাম কুরী আরম্ভ করলেন অনুসন্ধান। কিন্তু পরীক্ষাগার বা ল্যাবোরেটরি বলতে তিনি কিছুই পান নি, একটা ঠাণ্ডা স্যাঁত-সেতে গুদাম ঘরের একটা অংশ জোড়া তাড়া দিয়ে কয়েকটি যন্ত্র খাড়া করে তিনি তাঁর গবেষণা শুরু করলেন। পৃথিবীতে কোন যুগে আর কোন বিজ্ঞানী এই রকম অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে বিজ্ঞানের সাধনা করেন নি।

ইউরেনিয়ম পাওয়া যাচ্ছিল পিচব্লেণ্ড (Pitchblende) নামে এক খনিজ পদার্থ থেকে। ম্যাডাম কুরী লক্ষ্য করলেন যে, পিচব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়ম বের করে নেবার পর যা বাকি থাকে, আর যাকে এতদিন অকেজো বলে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, সেই পরিত্যক্ত অংশের তেজ ইউরেনিয়মের তেজের অনেক গুণ বেশি। ঠিক এই সময় অধ্যাপক কুরী এই কাজে যোগ দিলেন। দুইটি প্রতিভার সংযোগ হল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটাও ছিল একটি অভাবনীয় ঘটনা। তখন অধ্যাপকের উপার্জন অল্প, ইরীণ বলে তাঁদের একটি কন্যা হয়েছে। বাধ্য হয়ে ম্যাডাম কুরীকে নিকটবর্ত্তী একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে হল।

এই গবেষণার জন্য একটি ভাল পরীক্ষাগারের প্রয়োজন ছিল। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে এজন্য অনুরোধ করে তাঁরা নিরাশ হলেন। তাঁরা এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ঘর ছেড়ে দিতে পারলেন না, শেষে কুরী দম্পতি একটি চালা ঘরকে তাঁদের পরীক্ষাগার রূপে বানিয়ে নিলেন। ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে, মেঝে পাকা নয়, আর দুটো নড়নড়ে টেবিল ছাড়া ঘরে আসবাবপত্র বলতে আর কিছু নেই। শীতের দিনে সেখানে তাঁরা প্রায় জমে যেতেন, গ্রীষ্মকালে দম বন্ধ হয়ে আসত। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত তাঁরা গবেষণায় নিযুক্ত রইলেন। পরবর্তিকালে ম্যাডাম কুরী বলতেন: 'জীবনের এই সময়টি আমাদের সবচেয়ে আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটেছে।'

কুরী দম্পতি ভাবলেন যে পিচব্লেণ্ডে এমন কোন অনাবিষ্কৃত পদার্থ আছে যা ইউরেনিয়মের অনেকগুণ বেশি তেজস্কর। এই নতুন পদার্থের আবিষ্কারে তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন। কিন্তু এর জন্য দরকার বহুপরিমাণে পিচব্লেণ্ড, তা কেনবার পয়সা তাঁদের নেই। অস্ট্রিয়ার গভর্নমেণ্ট দয়া পরবশ হয়ে বোহিমিয়ার এক খনি থেকে তোলা এক টন পিচব্লেণ্ড কুরী দম্পতিকে পাঠিয়ে দিলেন। এখন তাঁরা দুজনে এক কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত রইলেন। কি করে ঐ শক্ত পদার্থ থেকে তাঁদের কল্পিত ঐ নতুন পদার্থটিকে বের করা যেতে পারে। চলতে থাকে নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া। প্রথমে তাঁরা এক নতুন পদার্থ পেলেন যা ইউরেনিয়ামের চেয়ে কিছু বেশি তেজস্কর। জন্মভূমি পোলাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ম্যাডাম কুরী ঐ পদার্থটির নাম দিলেন পলোনিয়ম।

কিন্তু পলোনিয়ম বের করে নেবার পরও দেখা গেল যে আগের তেজ প্রায় সমানই রয়ে গেল। তা হলে পলোনিয়ম ছাড়া অন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিশ্চয়ই ওর মধ্যে আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কয়েক বছর ধরে সমানভাবে পরীক্ষাগারে কাজ চলতে

লাগল, অদম্য উৎসাহে কুরী দম্পতি তাঁদের সাধনায় মগ্ন রইলেন।

১৯০২। বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় বৎসর। এই বছরে কুরী দম্পতি রেডিয়ম বলে এক নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন, বিশুদ্ধ অবস্থায় নয়, রেডিয়ম ক্লোরাইড রূপে। দেখা গেল, এই বস্তু সমপরিমাণ ইউরেনিয়মের প্রায় লক্ষগুণ বেশি তেজস্কর। যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁরা রেডিয়ম ক্লোরাইড পেলেন তা কি রকম শ্রমসাধ্য আর সময় সাপেক্ষ তা এই থেকে বোঝা যাবে যে, কুরীরা চার বছর পরিশ্রমের পর একটন পিচব্লেণ্ড থেকে এক গ্র্যামের আটভাগের একভাগ মাত্র রেডিয়ম ক্লোরাইড পেলেন, তাও অবিশুদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু যা পাওয়া গেল তা যে এক নতুন পদার্থ সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না।

১৯০৩। ম্যাডাম কুরী এক বক্তৃতায় তাঁদের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। বিজ্ঞান জগতে একটা সাড়া পড়ে গেল। সাড়া পড়ে গেল পৃথিবীময়। কয়েক মাস পরে তাঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে তাঁরা লণ্ডনে নিমন্ত্রিত হলেন। গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত বিজ্ঞানী এই রেডিয়ম দেখতে আর তার গুণাবলী জানতে সমবেত হলেন। অধ্যাপক কুরী পরীক্ষায় দেখালেন যে কাছে যদি জিঙ্ক সালফাইডের (Zinc Sulphide) গুঁড়া ধরা যায়, তবে তা সব সময়ই ঝিক্‌মিক করতে থাকে। এইদিনের সভায় ম্যাডাম কুরী সমবেত বিজ্ঞানীদের যখন বললেন: 'We have really uncovered an inexhaustible Golconda a single gram of radium is worth 150,000'—'আমরা সত্যই একটি অফুরন্ত গোলকুণ্ডার হীরকখনি আবিষ্কার করেছি, মাত্র এক গ্রাম রেডিয়মের দাম দেড়লক্ষ ডলার'। তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা ছিল না।

১৮৯৯ থেকে ১৯০৪—এই পাঁচ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ত্রিশটার

বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সেসব প্রবন্ধের একটিতে তাঁরা রেডিয়মের প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যও উপস্থাপিত করেন। সেগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, কতকগুলি ব্যাধির পক্ষে রেডিয়ম প্রযোজ্য: 'It dertroyed infected cells, stopped harmful growths, and even arrested some forms of cancer.' চিকিৎসাজগৎ এই তথ্য সাগ্রহে গ্রহণ করল। ১৯০২ সালে আকাদেমি অব সায়ান্স কুরীদের কুড়িহাজার ফ্রাঙ্ক প্রদান করলেন পিচব্লেণ্ড থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বের করার জন্য, আর প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাডাম কুরীকে বিজ্ঞানে 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করলেন। ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হল কুরী দম্পতিকে আর বেকারেলকে তেজস্ক্রিয় বা radio activity সম্বন্ধে তাঁদের আবিষ্কারের জন্য। এই তিনজনই ছিলেন এই ক্ষেত্রে পুরোধা। এই প্রথম একজন মহিলা নোবেল পুরস্কার পেলেন।

কৃতজ্ঞ ফরাসি দেশ দুটি নতুন পদের সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরীদম্পতিকে বসালেন। জীবনে এই প্রথম তাঁরা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের অদৃষ্টে এ সুখশান্তি বেশিদিন টিকল না। কুরী দম্পতি তখন্ তাঁদের খ্যাতির শীর্ষস্থানে যখন একদিন রাস্তায় চলবার সময় অধ্যাপক কুরী গাড়ি চাপা পড়লেন, মুহূর্তমধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটল। শুধু কুরীর আবাসে নয়, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে শোকের একটা ঘনছায়া পড়ল। এই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯০৬ সালের ১৯ এপ্রিল।

বিশ্ববিদ্যালয় পিরী কুরীর স্থলে ম্যাডাম কুরীকে অধ্যাপিকা নিযুক্ত করল। সে এক নিদারুণ শোকের দৃশ্য যেদিন ম্যাডাম কুরী তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হলেন। হলে যত লোক ধরে তার দশগুণ লোক এসেছে, অধিকাংশ লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। ঘড়িতে দেড়টা বাজল, ধীর পদবিক্ষেপে পিছনের দরজা দিয়ে

অধ্যাপিকা হলে ঢুকলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুল জয়ধ্বনি করে তাঁকে অভিবাদন জানাল। তারপর সভা স্তব্ধ, সকলে উদগ্রীব। কিভাবে তিনি তাঁর বক্তৃতা সুরু করবেন। তাঁকে এই সম্মানিত পদ দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ দিয়ে কি আরম্ভ করবেন। নতুন অধ্যাপকের রীতি হল যে, তিনি যাঁর জায়গায় এসেছেন তাঁর গুণগান আরম্ভ করা। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি যে স্বামী অধ্যাপিকা আরম্ভ করলেন তাঁর স্বামীর শেষ বক্তৃতায় যে বাক্য উচ্চারণ করে চিরদিনের মতো থেমে গিয়েছিলেন, ঠিক তারপর থেকে।

নিঃসঙ্গ জীবনে কন্যা দুটিকে নিয়ে, ম্যাডাম কুরী তাঁর গবেষণায় নিমগ্ন রইলেন। শেষে ১৯১১ সালে তিনি বিশুদ্ধ পলোনিয়ম ও ও রেডিয়ম বার করলেন। এই কাজের জন্য ঐ বছরে আবার তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, এবার রসায়ন বিভাগ থেকে। এর আগে বা এর পরে কোন পুরুষ বা কোন নারী দুইবার এই দুর্লভ পুরস্কার লাভ করেননি। তখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ বছর। সুইডেনে এই পুরস্কার নিতে যখন তিনি গেলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুর আট বছর পরে, ম্যাডাম কুরী যখন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে যাবেন কেবল তখনই একটি রেডিয়ম ইনষ্টিটিউট স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতে প্রচুর অর্থ দিলেন। এর আগে পর্যন্ত তাঁদের গবেষণার জন্য একখানি ঘর ছেড়ে দেওয়াও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকেও তাঁকে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল এই জন্য। ১৯১৪ সালে রেডিয়ম ইনষ্টিটিউট উদ্বোধনের দিন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের শেষভাগে ম্যাডাম কুরী বলেছিলেন: 'This is the temple of the future. It is there that humanity grows bigger, strengthens and letters itself' আমাদের দেশে বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র বসু যখন তাঁর নিজস্ব বোস ইনষ্টিটিউটের উদ্বোধন করেন সেদিন

তিনিও অনুরূপ ভাব প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বক্তৃতায়। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে এই দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশি।

রেডিয়ম ইনস্টিটউট প্রতিষ্ঠিত হল, বহু বিজ্ঞানী সমবেত হয়ে তাঁর নির্দেশে কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু এর অব্যবহিত পরে সমগ্র ইউরোপে সমরাণল জ্বলে উঠল, সহকারীরা সব চলে গেলেন, ম্যাডাম কুরী একলা পড়লেন। তখন রেডিয়ম সম্বন্ধে কাজ বন্ধ করে ধনীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি আহত সৈন্যদের চিকিৎসার্থে ভ্রাম্যমান এক্স-রশ্মি যন্ত্রের সরঞ্জাম নির্মাণ করে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাতে লাগলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর রেডিয়ম সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা আবার আরম্ভ হল। নব নব আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হতে থাকল।

নানা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর উপর সম্মান বর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতেন। লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া, এই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। দুটি কন্যাকে নিয়ে তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

আটান্ন বছর বয়সে জন্মভূমি পোলাণ্ডে গিয়ে ওয়ারশতে একটি রেডিয়ম ইনস্টিটিউটের শিলান্যাস করেন। বাষট্টি বছর বয়সে দ্বিতীয়বার আমেরিকা দর্শনে যান ও সেখানে দ্বিতীয়বার একগ্রাম রেডিয়ম উপহার স্বরূপ লাভ করেন। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও তাঁকে প্রত্যহ বার থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখে সবাই বিস্মিত হত। রেডিয়ম নিয়ে কাজ করার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়, এজন্য চারবার চোখের ছানি অপারেশন করাতে হয়েছিল। কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি তিনি আর ফিরে পাননি। অবশেষে ১৯৩৪, ৪জুলাই, আটষট্টি বছর বয়সে এই কীর্তিমান বিজ্ঞানীর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়। আইনস্টাইন বলেছিলেন, ম্যাডাম কুরী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে খ্যাতি নষ্ট করেনি। এই বিজ্ঞানীর জীবনে এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল।

আলবার্ট আইনস্টাইন

(১৮৭৯-১৯৫৫)

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক একজন মহামানবের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা মানবজাতির চিন্তাধারাকে হঠাৎ একটা অত্যুচ্চ শিখরে উত্তোলন করেন। এঁদের আগমন সচরাচর ঘটেনা। যখন আর্বিভূত হন, সমসাময়িক লোকের পক্ষে তাঁদের নাগাল পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠে। আমাদের কালে এইরকম একজন মনীষীর আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ইনি হলেন মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ (Theory of Relativity) এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, সবচেয়ে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

অথচ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় অগ্রসর হওয়ার জন্য সহায়ক উপকরণের মধ্যে ছিল মাত্র একটি পেন্সিল আর ছোট্ট একটি খাতা। কোন বিরাট পরীক্ষাগার তাঁর প্রয়োজন হয়নি, মস্তিষ্ক ও মেধাই ছিল তাঁর গবেষণাগার। 'My brain is my laboratory' —একথা বিজ্ঞানী নিজেই বলেছেন। সেই গবেষণাগারের সাহায্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, তার চেয়েও অনেক দূর পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাছের জিনিসকে স্পষ্টতর করে তোলে। তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তিনি যে কোন জিনিস দেখতে পেতেন। দৃশ্য ও অদৃশ্য যেখানে গিয়ে মিলেছে, আইনস্টাইন একাকী আপন মহিমায় সেখানে সেই মোহনায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি এক জগৎ থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে অন্য জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে গিয়েছেন। তিনি একাধারে ছিলেন বিজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞজন।

দক্ষিণ জার্মানির উলম শহর। সেই শহরে সঙ্গতি সম্পন্ন এক পরিবারে ১৮৭৯, ১৪ মার্চ, আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার তিনি ছিলেন একমাত্র পুত্র; মেয়ে একটি। এই বছরের (১৯৭৯) মার্চ মাসে সারা পৃথিবীতে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর নিজস্ব একটি ব্যবসার প্রতিষ্ঠান ছিল; সেইসূত্রে ছেলের জন্মের এক বছর পরে আইনস্টাইন পরিবার ইতালির মিলান শহরে এসে বসবাস করতে থাকেন। আলবার্টের যৌবন কালের বেশির ভাগ মিউনিকে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর বাবার ছিল ইলেক্ট্রো কেমিক্যালের ছোট একটি কারখানা। পিতা ও তাঁর এক অকৃতদার খুল্লতাত এই দুজনে মিলে সেটি চালাতেন।

তাঁদের মায়ের আকর্ষণ ছিল সংগীতে, বিশেষ করে বীঠোফেনের সংগীত। মায়ের সংগীত-প্রীতি পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। মায়ের কাছেই আইনস্টাইন ছয় বছর বয়সে বেহালা বাজাতে শেখেন। সেই থেকে বেহালা ছিল তাঁর সারা জীবনের সাথী বিজ্ঞানীর চিত্ত-বিনোদনের একমাত্র উপকরণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালা বাদকদের মধ্যে অন্যতম রূপে তিনি গণ্য হতেন, এমনি সুন্দর বাজাতেন তিনি। সুরের মধ্যেই তো তাঁর জগদ্বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল। সে কাহিনী রোমাঞ্চকর। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী বলেছেন: 'ঘটনাটি ১৯০৫ সালের। একদিন সকালে প্রাতরাশ অর্ধসমাপ্ত রেখেই আলবার্ট উপরের ঘরে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে এক প্রান্তে ছিল অর্গান। বহুক্ষণ ধরে তিনি অর্গান বাজাতে লাগলেন, আমরা নীচে বসে তা শুনতে লাগলাম। যেন তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছেন—মনে হল তিনি সুরের জগতে হারিয়ে গেছেন। সাতদিন সেই ঘরেই রইলেন; খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হত উপরে। সাতদিন বাদে এক তাড়া কাগজ হাতে নিয়ে তিনি নীচে নেমে এলেন। এসে বললেন, সেদিন প্রাতরাশের টেবিলে হঠাৎ আমার মাথায় এসেছিল একটা আইডিয়া (idea)—সেইটাকে

রূপায়িত করলাম। ঐ কাগজের তাড়ার মধ্যেই লিপিবদ্ধ ছিল তাঁর যুগান্তকারী আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র।

রূপকথার মতোই আশ্চর্য এই কাহিনী। অথচ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, ছাত্রজীবনে কিন্তু এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তেমন কোন ছাপ রাখতে পারেন নি তাঁর শিক্ষকদের মনে যা থেকে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে দর্শন শাস্ত্রের তিনি একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন তাঁর স্কুলজীবন থেকেই। চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি কান্টের বই পড়ে শেষ করেছিলেন। পনর বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল সুইজারল্যাণ্ডের একটি পলিটেকনিক্যাল স্কুলে। এখানে থেকে দুবারের চেষ্টায় তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হয়। কিন্তু তরুণ আইনস্টাইন আকৃষ্ট হলেন বিশ্বজগতের রহস্য উদ্ঘাটনে, ব্যবসা জগতের লাভ-লোকসানের প্রতি নয়। মানুষের ভিতরকার প্রেরণাই যে তার ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে দেয়—এটি এই বিজ্ঞানীর জীবনে একটি পরীক্ষিত সত্য।

অতঃপর পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভের জন্য আইনস্টাইন কৃত সংকল্প হলেন। তিনি যখন জুরিচের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তিনি ঐ শহরের একটি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন, পরে অন্য একটি স্কুলে। বাইশ বছর বয়সে তিনি সুইস নাগরিকত্ব লাভ করেন। স্নাতক হওয়ার পর ১৯০১ সালে তাঁরই পূর্ব পরিচিতা এক সহপাঠিনীকে তিনি বিবাহ করেন। এই তরুণীর নাম সিলেভা ম্যারেক; গণিতে তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। সিলেভার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিনিময় করে আলবার্ট আনন্দ পেতেন।

বিয়ের পর সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য আইনস্টাইন বার্ন শহরের একটি পেটেন্ট আপিসে চাকরি গ্রহণ করলেন—নিতান্তই করণিকের চাকরি। সেই বয়সে তিনি দেখতে খুব প্রিয়দর্শন ছিলেন, তাঁর স্বভাবের মধ্যে এমন একটি মিষ্টতা ছিল যা সকলকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করত।

অতি সযত্নে ছাঁটা ঘন কৃষ্ণবর্ণের গুম্ফরাজি, মাথার উপর পরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত একরাশ কালো চুল—তাঁর আকৃতির মধ্যে এই দুটিই ছিল লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধারণের মধ্যে মানুষটি যে অসাধারণ, এটা শুধু বুঝতে পারা যেত তাঁর আয়ত চক্ষু দুটির দিকে তাকালে—সেই চক্ষুর দৃষ্টিতে ছিল যুগপৎ একজন দার্শনিকের সুগভীর চিন্তা আর বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনে এক বিজ্ঞানীর অতন্দ্র ব্যগ্রতা। তাঁর সমগ্র সত্তাই ছিল একটা অদৃশ্য শক্তির দ্যোতনায় বিমণ্ডিত; উৎসাহ-উদ্দীপনায় সদ্য আন্দোলিত। যে কোন বিষয় তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারতেন।

১৯০৫। বার্লিনের একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ বেরুল। প্রবন্ধের বিষয়: 'On the Electrodynamics of Moving Bodies'; প্রবন্ধের অর্ধেকটা ছিল সমীকরণ-নানাবিধ অঙ্ক। লেখকের নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন, নিতান্তই পেটেণ্ট আপিসের একজন করণিক। কিন্তু এই প্রবন্ধটির মধ্যে বিজ্ঞান-জগতের যে একটি যুগান্তকারী বার্তা নিহিত ছিল- যে আবিষ্কারের ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন ও পদার্থের গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের এতদিনের ধারণা বদলিয়ে যাবে—পনর বছর পরে সেটা বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে 'Relativity, the Special and General Theory' নামে আইনস্টাইন দ্বিতীয় প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হলো তখন সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানী ও গাণিতিকদের মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হল।

পদার্থ অবিনশ্বর, আর শক্তিরও হ্রাসবৃদ্ধি নেই—বিজ্ঞানীরা এই দুই সিদ্ধান্ত অনেকদিন ধরে মেনে আসছিল, আর এর ব্যতিক্রম কোথাও লক্ষ্য করেনি। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন বললেন যে, পদার্থ ও শক্তি এক অন্যের রূপান্তরিত অবস্থা। পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না ('Matter can neither be

created nor destroyed.'), আইনস্টাইন অঙ্ক কষে প্রমাণ করলেন যে প্রচলিত এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভ্রান্ত। তাঁর কথা শুনে বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হলেন।

প্রকাশিত হল পৃথিবীতে একটি নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—যাকে বলা হয়েছে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেদিন এই নিয়ে বিজ্ঞানীসমাজে তুমুল কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ড, স্থান, কাল ও মহাকর্ষ সম্পর্কে পরিবর্তিত হয় মানুষের এতকালের ধারণা। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে 'গতি' (Motion) সম্পর্কে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীদের নির্ভর করতে হত নিউটনের Laws of Motion-এর উপর যা তিনি দুশো বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন। সময় স্থির নয়, ইথার নেই এসব কি কথা ?

আইনস্টাইনের তত্ত্ব বাস্তব জগতে প্রথম প্রমাণিত হল ১৯৩২ সালে কক্‌ক্রফ্‌ট এবং ওয়ালটনের পরীক্ষায়। পরে তাঁর তথ্যের উপর নির্ভর করে পরমাণু বোমা তৈরি হয়েছে এবং ১৯৪৫ সালে জাপানী শহর হিরোশিমার উপর অ্যাটম বোমার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়। এই পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ সম্ভব হয়েছিল ছাব্বিশ বছর বয়স্ক এক তরুণ পদার্থবিদের একটি মৌলিক আবিষ্কারের জন্য। এই শতাব্দীর সূচনাকালে বিজ্ঞান জগতে এক অখ্যাত তরুণ বিজ্ঞানী যখন তাঁর নবীনা প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন থেকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হয়ে যায় নিউটনের জগৎ ; সেইখানে দেখা দিল এক নতুন পৃথিবী—আইনস্টাইনের পৃথিবী। পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার একটা যুগ শেষ হয়ে শুরু হয় আর একটা নতুন যুগের। মহাকর্ষকে পিছনে ফেলে আমরা উপনীত হলাম পরমাণুর যুগে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এই যুগকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছে।

চিন্তারাজ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান এই আপেক্ষিকতাবাদ। এ তত্ত্ব

অতিশয় দুর্বোধ্য, আর জটিল আঁকজোগ ভিন্ন তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রথম যখন এ তত্ত্ব প্রচারিত হয় তখন, কথিত আছে, পৃথিবীর ছয় জন মাত্র মানুষ তা বুঝেছিল। যে সময় ইংলণ্ডে ইভনিং নিউজ পত্রিকা এক ব্যঙ্গ চিত্র বের করেছিল। চিত্রে আয়কর আইন প্রণেতা কয়েকজন ব্যক্তি টুপি খুলে হেঁট হয়ে আইনস্টাইনের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, দুর্বোধ্যতায় আপনি আমাদেরও হারিয়েছেন। এই আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব সহজ কথায় প্রকাশ করা যায় না। তবে এই থেকে যেসব কথা আসে তার কয়েকটা বলা যাচ্ছে।

এক ফুট লম্বা একটা লাঠি সামনে পড়ে রয়েছে। তুমি বলবে এক ফুট। আমি বলব এক ফুট, যে কেউ দেখবে বলবে এক ফুট। কিন্তু আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত থেকে এই দাঁড়ায় যে, এরোপ্লেনে উড়ে যেতে যেতে ঐ লাঠিটা দেখা যদি সম্ভব হয় তবে ঐ লাঠিটা লম্বায় এক ফুটের চেয়ে ছোট বলে মনে হবে, আর এরোপ্লেনের বেগ যদি আলোর বেগের সমান হয়, অবশ্য সবই নিছক কল্পনার কথা, তবে লাঠিটা একেবারে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। আলোর বেগের চেয়ে বেশি কোন বেগ হতে পারে না।

সময়ের দিক দিয়ে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত থেকে এমন সব মজার কথা এসে পড়ে যা শুনতে একেবারে রূপকথা বলে মনে হবে। মনে করা যাক, একটি এরোপ্লেনে চড়ে অনেক দিনের খাবারের সঞ্চয় নিয়ে একটি লোক শূন্যপথে চলতে লাগল, এরোপ্লেনের বেগ আলোর বেগের চেয়ে কম একটা নির্দিষ্ট বেগ। লোকটির সঙ্গে ঘরি আছে। যে ঘড়ির পাঁচ বছর কাল অবধি সটান চলে বাড়িমুখো হল, আর তার হিসাবে দশ বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে এল। যাবার সময় তার এই অভিযান নিয়ে হৈ-চৈ পরেছিল। লোকটি ভেবেছিল, ফেরামাত্র সে পাবে বিপুল অভিনন্দন। কিন্তু এ কি! ফিরে লোকটি দেখলে কেউ তাকে চেনে না, সেও কাউকে চেনে না। লোকজনের রীতিনীতি, দেশের অবস্থা, সব বদলে গিয়েছে। বহুকষ্টে বাড়ি ফিরে দরজায় যে বৃদ্ধটিকে

created nor destroyed.'), আইনস্টাইন অঙ্ক কষে প্রমাণ করলেন যে প্রচলিত এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভ্রান্ত। তাঁর কথা শুনে বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হলেন।

প্রকাশিত হল পৃথিবীতে একটি নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—যাকে বলা হয়েছে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেদিন এই নিয়ে বিজ্ঞানীসমাজে তুমুল কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ড, স্থান, কাল ও মহাকর্ষ সম্পর্কে পরিবর্তিত হয় মানুষের এতকালের ধারণা। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে 'গতি' (Motion) সম্পর্কে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীদের নির্ভর করতে হত নিউটনের Laws of Motion-এর উপর যা তিনি দুশো বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন। সময় স্থির নয়, ইথার নেই এসব কি কথা?

আইনস্টাইনের তত্ত্ব বাস্তব জগতে প্রথম প্রমাণিত হল ১৯৩২ সালে কক্‌ক্রফ্‌ট এবং ওয়ালটনের পরীক্ষায়। পরে তাঁর তথ্যের উপর নির্ভর করে পরমাণু বোমা তৈরি হয়েছে এবং ১৯৪৫ সালে জাপানী শহর হিরোশিমার উপর অ্যাটম বোমার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়। এই পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ সম্ভব হয়েছিল ছাব্বিশ বছর বয়স্ক এক তরুণ পদার্থবিদের একটি মৌলিক আবিষ্কারের জন্য। এই শতাব্দীর সূচনা-কালে বিজ্ঞান জগতে এক অখ্যাত তরুণ বিজ্ঞানী যখন তাঁর নবীনা প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন থেকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হয়ে যায় নিউটনের জগৎ; সেইখানে দেখা দিল এক নতুন পৃথিবী—আইনস্টাইনের পৃথিবী। পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার একটা যুগ শেষ হয়ে শুরু হয় আর একটা নতুন যুগের। মহাকর্ষকে পিছনে ফেলে আমরা উপনীত হলাম পরমাণুর যুগে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এই যুগকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছে।

চিন্তারাজ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান এই আপেক্ষিকতাবাদ। এ তত্ত্ব

অতিশয় দুর্বোধ্য, আর জটিল আঁকজোগ ভিন্ন তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রথম যখন এ তত্ত্ব প্রচারিত হয় তখন, কথিত আছে, পৃথিবীর ছয় জন মাত্র মানুষ তা বুঝেছিল। যে সময় ইংলণ্ডে ইভনিং নিউজ পত্রিকা এক ব্যঙ্গ চিত্র বের করেছিল। চিত্রে আয়কর আইন প্রণেতা কয়েকজন ব্যক্তি টুপি খুলে হেঁট হয়ে আইনস্টাইনের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, দুর্বোধ্যতায় আপনি আমাদেরও হারিয়েছেন। এই আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব সহজ কথায় প্রকাশ করা যায় না। তবে এই থেকে যেসব কথা আসে তার কয়েকটা বলা যাচ্ছে।

এক ফুট লম্বা একটা লাঠি সামনে পড়ে রয়েছে। তুমি বলবে এক ফুট। আমি বলব এক ফুট, যে কেউ দেখবে বলবে এক ফুট। কিন্তু আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত থেকে এই দাঁড়ায় যে, এরোপ্লেনে উড়ে যেতে যেতে ঐ লাঠিটা দেখা যদি সম্ভব হয় তবে ঐ লাঠিটা লম্বায় এক ফুটের চেয়ে ছোট বলে মনে হবে, আর এরোপ্লেনের বেগ যদি আলোর বেগের সমান হয়, অবশ্য সবই নিছক কল্পনার কথা, তবে লাঠিটা একেবারে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। আলোর বেগের চেয়ে বেশি কোন বেগ হতে পারে না।

সময়ের দিক দিয়ে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত থেকে এমন সব মজার কথা এসে পড়ে যা শুনতে একেবারে রূপকথা বলে মনে হবে। মনে করা যাক, একটি এরোপ্লেনে চড়ে অনেক দিনের খাবারের সঞ্চয় নিয়ে একটি লোক শূন্যপথে চলতে লাগল, এরোপ্লেনের বেগ আলোর বেগের চেয়ে কম একটা নির্দিষ্ট বেগ। লোকটির সঙ্গে ঘরি আছে। যে ঘড়ির পাঁচ বছর কাল অবধি সটান চলে বাড়িমুখো হল, আর তার হিসাবে দশ বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে এল। যাবার সময় তার এই অভিযান নিয়ে হৈ-চৈ পরেছিল। লোকটি ভেবেছিল, ফেরামাত্র সে পাবে বিপুল অভিনন্দন। কিন্তু এ কি! ফিরে লোকটি দেখলে কেউ তাকে চেনে না, সেও কাউকে চেনে না। লোকজনের রীতিনীতি, দেশের অবস্থা, সব বদলে গিয়েছে। বহুকষ্টে বাড়ি ফিরে দরজায় যে বৃদ্ধটিকে

দেখল, পরিচয়ে জানল সে তার পৌত্র। ঘরে একটা ক্যালেণ্ডারে দেখলে, সেটা ২০৬৩ সাল। অর্থাৎ তার দশ বছরে পৃথিবীর এক শো বছর চলে গিয়েছে।

থাক এসব কল্পনা। আইনষ্টাইন বললেন যে আকাশ সমাকার নয়, বক্রাকার। ফলে এই দাঁড়াল যে আকাশে কোন সরল রেখাকে আর ইউক্লিডের, সরল রেখায় সংজ্ঞার্থ দিলে চলবেনা। ত্রিকোণের তিনটি কোন আর ১৮০ ডিগ্রী নয়। বৃত্তের ব্যাসগুলি আর সমান নয়, সমান্তরাল তুই সরল রেখা যে একেবারে মেলে না তা নয়। আইনষ্টাইস্টাইনের কথায় এই দাঁড়ায় যে, স্থানের সঙ্গে কাল জড়িত।

তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে কতকগুলি ব্যাপার দাঁড়ায় যা পরীক্ষায় যাচাই করা যায়। তাঁর অলোচনার একটা কথা এই যে, আলোর রশ্মিও মহাকর্ষের হাত এড়াতে পারে না। পৃথিবীর পাশ দিয়ে যে রশ্মিটা যাচ্ছে পৃথিবী তাকে টানছে, তবে এই আকর্ষণটা এতই কম যে তা পরীক্ষায় ধরা যায় না। আচ্ছা, পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পদার্থ নেওয়া যাক যা পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি ভারি, যার আকর্ষণ এই পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল, যেমন সূর্য। আইনস্টাইন হিসাব করে বললেন যে, কোন নক্ষত্র থেকে আলো যদি সূর্যের খুব কাছ দিয়ে এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় তবে সূর্যের আকর্ষণের জন্য ঐ রশ্মি একটু বেঁকবে। আর সেই বাঁকের পরিমাণ হবে এক ডিগ্রীর প্রায় তু হাজার ভাগের এক ভাগ। যদিও খুব কম তবুও সূক্ষ্ম যন্ত্রে তা ধরা যেতে পারে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়

১। খ্রীষ্ট জন্মের আনুমানিক তিনশো বছর আগে গ্রীসে এর জন্ম। জ্যামিতি শাস্ত্রের জনক। ইউক্লিড সম্বন্ধে আইনস্টাইনের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি : যৌবন কালে ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গে যার নিবিড় পরিচয় না ঘটেছে তার পক্ষে একজন তাত্ত্বিক গবেষক হওয়া অসম্ভব' তিনি নিজে জ্যামিতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন।

যখন সূর্যের তীব্র আলো নক্ষত্রের আলোকে ঢেকে দিচ্ছে না। তখন নক্ষত্র থেকে যে আলো রশ্মি সূর্যের খুব কাছ দিয়ে আসছে তা বেঁকল কিনা সে সম্বন্ধে পরীক্ষা হল। দেখা গেল বেঁকেছে। আর আইনস্টাইন যতটা বলেছিলেন ঠিক ততটাই বেঁকেছে। আর একটা ব্যাপার। নিউটনের বলবিদ্যার হিসাব অনুসারে বুধগ্রহের যে পথে চলা উচিত, বরাবর দেখা যাচ্ছিল ঐ গ্রহ অবিকল সেই পথে চলেনা, একটু ব্যতিক্রম হয়। এর কোন কারণ জানা যায়নি। আইনস্টাইনের হিসাবে এ গরমিল আর রইল না।

১৯২১ সালে তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অপেক্ষিকতত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার চার বছর পরে সেই পেটেন্ট আপিসের করণিক আইনস্টাইনকে আমরা দেখতে পাই জুরিচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে এবং এখানে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি যোগদান করেন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশেষে তিনি বার্লিনের জগদ্বিখ্যাত কাইজার বিইলহেলম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন এবং এই সময়েই তিনি আর একটি দুর্লভ সম্মান লাভ করেন তিনি প্রাসিয়ান অকাদেমির সদস্য নির্বাচিত হন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে সর্বত্র লাভ করেন সানুরাগ অভ্যর্থনা।

পরিণত বয়সে আইনস্টাইন যে নতুন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন তাকে মানববুদ্ধির চরম পরিচায়ক বলা যেতে পারে। মাত্র চারটি সমীকরণ (Eguation), তার মধ্যে ধরা পড়েছে বিশ্বের যত কিছু তথ্য। প্রকৃতির যত কিছু রহস্য আছে এই নতুন তথ্য তা উদ্ঘাটন করেছে। এই তথ্যের মূল কথা হল—নক্ষত্র, গ্রহ, আলোক, বিদ্যুৎ, পরমাণু সর্বত্র একই নিয়ম কাজ করেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন। আইনস্টাইন বলতেন, বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য হল প্রকৃতির যত বেশি রহস্যকে যত কম সূত্রে প্রকাশ করা যায়। এই মহাবিজ্ঞানী বোধ হয় এতদিন বিজ্ঞানকে সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিলেন।

দেখল, পরিচয়ে জানল সে তার পৌত্র। ঘরে একটা ক্যালেণ্ডারে দেখলে, সেটা ২০৬৩ সাল। অর্থাৎ তার দশ বছরে পৃথিবীর এক শো বছর চলে গিয়েছে।

থাক এসব কল্পনা। আইনষ্টাইন বললেন যে আকাশ সমাকার নয়, বক্রাকার। ফলে এই দাঁড়াল যে আকাশে কোন সরল রেখাকে আর ইউক্লিডের, সরল রেখায় সংজ্ঞার্থ দিলে চলবেনা। ত্রিকোণের তিনটি কোন আর ১৮০ ডিগ্রী নয়। বৃত্তের ব্যাসগুলি আর সমান নয়, সমান্তরাল দুই সরল রেখা যে একেবারে মেলে না তা নয়। আইনষ্টাইস্টাইনের কথায় এই দাঁড়ায় যে, স্থানের সঙ্গে কাল জড়িত।

তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে কতকগুলি ব্যাপার দাঁড়ায় যা পরীক্ষায় যাচাই করা যায়। তাঁর অলোচনার একটা কথা এই যে, আলোর রশ্মিও মহাকর্ষের হাত এড়াতে পারে না। পৃথিবীর পাশ দিয়ে যে রশ্মিটা যাচ্ছে পৃথিবী তাকে টানছে, তবে এই আকর্ষণটা এতই কম যে তা পরীক্ষায় ধরা যায় না। আচ্ছা, পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পদার্থ নেওয়া যাক যা পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি ভারি, যার আকর্ষণ এই পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল, যেমন সূর্য। আইনস্টাইন হিসাব করে বললেন যে, কোন নক্ষত্র থেকে আলো যদি সূর্যের খুব কাছ দিয়ে এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় তবে সূর্যের আকর্ষণের জন্য ঐ রশ্মি একটু বেঁকবে। আর সেই বাঁকের পরিমাণ হবে এক ডিগ্রীর প্রায় দু হাজার ভাগের এক ভাগ। যদিও খুব কম তবুও সূক্ষ্ম যন্ত্রে তা ধরা যেতে পারে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়

১। খ্রীষ্ট জন্মের আনুমানিক তিনশো বছর আগে গ্রীসে এর জন্ম। জ্যামিতি শাস্ত্রের জনক। ইউক্লিড সম্বন্ধে আইনস্টাইনের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি: যৌবন কালে ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গে যার নিবিড় পরিচয় না ঘটেছে তার পক্ষে একজন তাত্ত্বিক গবেষক হওয়া অসম্ভব' তিনি নিজে জ্যামিতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন।

যখন সূর্যের তীব্র আলো নক্ষত্রের আলোকে ঢেকে দিচ্ছে না। তখন নক্ষত্র থেকে যে আলো রশ্মি সূর্যের খুব কাছ দিয়ে আসছে তা বেঁকল কিনা সে সম্বন্ধে পরীক্ষা হল। দেখা গেল বেঁকেছে। আর আইনস্টাইন যতটা বলেছিলেন ঠিক ততটাই বেঁকেছে। আর একটা ব্যাপার। নিউটনের বলবিদ্যার হিসাব অনুসারে বুধগ্রহের যে পথে চলা উচিত, বরাবর দেখা যাচ্ছিল ঐ গ্রহ অবিকল সেই পথে চলেনা, একটু ব্যতিক্রম হয়। এর কোন কারণ জানা যায়নি। আইনস্টাইনের হিসাবে এ গরমিল আর রইল না।

১৯২১ সালে তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অপেক্ষিকতত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার চার বছর পরে সেই পেটেন্ট আপিসের করণিক আইনস্টাইনকে আমরা দেখতে পাই জুরিচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে এবং এখানে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি যোগদান করেন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশেষে তিনি বার্লিনের জগদ্বিখ্যাত কাইজার বিইলহেলম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন এবং এই সময়েই তিনি আর একটি দুর্লভ সম্মান লাভ করেন তিনি প্রাসিয়ান অকাদেমির সদস্য নির্বাচিত হন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে সর্বত্র লাভ করেন সানুরাগ অভ্যর্থনা।

পরিণত বয়সে আইনস্টাইন যে নতুন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন তাকে মানববুদ্ধির চরম পরিচায়ক বলা যেতে পারে। মাত্র চারটি সমীকরণ (Eguation), তার মধ্যে ধরা পড়েছে বিশ্বের যত কিছু তথ্য। প্রকৃতির যত কিছু রহস্য আছে এই নতুন তথ্য তা উদ্‌ঘাটন করেছে। এই তথ্যের মূল কথা হল—নক্ষত্র, গ্রহ, আলোক, বিদ্যুৎ, পরমাণু সর্বত্র একই নিয়ম কাজ করেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন। আইনস্টাইন বলতেন, বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য হল প্রকৃতির যত বেশি রহস্যকে যত কম সূত্রে প্রকাশ করা যায়। এই মহাবিজ্ঞানী বোধ হয় এতদিন বিজ্ঞানকে সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিলেন।

জাতিতে আইনস্টাইন য়িহুদী ছিলেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের জার্মানিতে তাঁর স্থান হয়নি। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাতিল করে দেওয়া হয়, এমন কি তাঁকে যে সম্মানিত জার্মান নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছিল তাও ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি আমেরিকায় চলে আসেন। নিউ জার্সির প্রিন্সটনে অবস্থিত Institute of Advanced Studies তাঁকে মাসিক আট হাজার ডলার বেতনে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু শক্তির (যার মূল আবিষ্কর্তা তিনি) বিশ্ববিধ্বংসী রূপ দেখে পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানদের তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন: মানবসমাজের কল্যাণের জন্যই এই শক্তি ব্যবহার করা উচিত।'

১৯৫৫, ১৮ এপ্রিল, ছিয়াত্তর বছর বয়সে মানববন্ধু ও মানবতার উপাসক আলবার্ট আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়।

উইলিয়ম হার্ভে

(১৫৭৮-১৬৫৭)

ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন প্রথম চার্লস।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের জনগণের মন থেকে কুসংস্কার একেবারে লুপ্ত হয়নি। তখনও ডাইনীর ভয়টা লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল। শেক্সপীয়র তাঁর 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দর্শকদের দৃষ্টিপথে বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকের পটভূমিকায় তিনটি ডাইনীকে উপস্থাপিত করেছেন। ১৬৩৪ সালে সমুদ্রে প্রবল ঝড় উঠেছিল। ইংলণ্ডের রাজা তখন এক প্রতিবেশি রাষ্ট্রে এই মর্মে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন ঃ

'The greatest news from the country is of a huge pack of witches. It is suspected that they had a hand in raising the great storm at sea.'

সামুদ্রিক ঝড়টার পিছনে একদল ডাইনীর হাত আছে, ইংলণ্ডের রাজার মনে পর্যন্ত এই সন্দেহ জেগেছিল। আসলে সন্দেহটা কুসংস্কারের নামান্তর ছিল। তবে ঐ বছরে ইংলণ্ডের সমুদ্র উপকূলে যে প্রবল ঝড় দেখা গিয়েছিল সেই খবরটা সেদিন সংবাদপত্রে শিরোনাম রূপেই ছাপা হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে ওদেশের জনসাধারণ তখনও ডাইনীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। এই ডাইনিদের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবার ভার পড়েছিল রাজ চিকিৎসক ডাক্তার উইলিয়ম হার্ভের উপর। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত করে রাজার কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ রিপোর্টে ডাক্তার হার্ভে ডাইনীদের বেকসুর খালাস দিয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'সমুদ্র উপকূলে যে প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিয়েছিল তা কোন আলৌকিক

ব্যাপার নয়—নিতান্তই প্রাকৃতিক দুর্যোগ।' তখন রাজার মন থেকে কুসংস্কার দূর হয়, তবে লোকের মন থেকে নয়।

এই উইলিয়ম হার্ভের নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের তালিকার অন্তর্গত নয়, কারণ তিনি তাঁর সময়কার প্রচলিত ডাইনী-ভীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন। রক্ত চলাচলের রহস্যের আবিষ্কর্তা হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৬২৮ সালে 'Anatomical Dissertation concerning the Motion of the Heart and Blood in animals' নামে পঁচাত্তর পৃষ্ঠার যে পুস্তিকাটি তিনি প্রকাশ করেন সেটি জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছিল।

১৫৭৮ সালে ইংলণ্ডের ফোক্স্টোন শহরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে হার্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা টমাস হার্ভে একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী ছিলেন ; তিনি বহুকাল ফোক্স্টোন পৌরসভার অল্ডারম্যান ছিলেন এবং পরে মেয়র হয়েছিলেন। তাঁর দশটি সন্তানের মধ্যে তিনটি ছিল কন্যা, আর সাতটি পুত্র। হার্ভে পরিবারটি যেমন সঙ্গতিসম্পন্ন তেমনি সুখী ছিল। দশ বছর বয়সে কিংস স্কুলে ভর্তি হলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই বছরটি স্মরণীয় হয়ে আছে ব্রিটিশ নৌশক্তির কাছে স্প্যানিস নৌবহর পর্যুদস্ত হওয়ার জন্য। পনর বছর বয়সে উইলিয়ম কেমব্রিজের কেন্‌স কলেজে প্রবিষ্ট হলেন। এইখানে পড়বার সময় তিনি আকৃষ্ট হন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি।

কেমব্রিজ থেকে তিনি এলেন পাডুয়াতে। পাডুয়া তখন ইউরোপে একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। এইখানেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন। গ্যালিলিও এবং ডেসালিয়স (১৫১৪-১৫৬৪) এক সময়ে এখানে অধ্যাপনা করতেন। হার্ভে যখন এখানে একজন ছাত্র হয়ে এলেন তখন ডেসালিয়সের কোন প্রভাবই বিদ্যমান ছিলনা, এমন কি শারীরবৃত্ত (Anatomy) সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক কাজ তখন এখানে উপেক্ষিত—শতাব্দীব্যাপী প্রচলিত গ্যালেনের ধারা অনুযায়ী

ছাত্ররা শিক্ষালাভ করত। এজন্য হার্ভে মনে মনে খুব অসুখী বোধ করতেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে এই নিয়ে কোন আলোচনা করতেন না। এখানকার উপাধি লাভ করে তিনি লণ্ডনে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করলেন আর অল্প সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজার চিকিৎসক-রূপে নিযুক্ত হলেন। সেই একই সময়ে তিনি কেমব্রিজের কলেজ অব ফিজিসিয়ানস-এ প্রবিষ্ট হন।

তিন বছর পরে তিনি উক্ত কলেজের একজন 'ফেলো' (Fellow) নির্বাচিত হন ও সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের অন্যতম চিকিৎসক নিযুক্ত হন। থিওরি অব মেডিসিন সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা দিতেন। অল্পদিনের মধ্যে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হিসাবে হার্ভের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি আপন প্রতিভাবলে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে হার্ভে রাজার চিকিৎসক ছিলেন। অলিভার ক্রমওয়েল তখন প্রধান মন্ত্রী। পার্লামেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজার বিবাদ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে ১৬৩২ সালে হার্ভে অক্সফোর্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন ও নিজের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ১৬২৯ সালে রাজার শিরচ্ছেদ হওয়ার পর রাজসভার সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে হার্ভের এত উচ্চ স্থান কেন? কিজন্য তিনি এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন? তাঁর আগে থেকেই চিকিৎসকদের জানা ছিল যে হৃদয়ের মধ্যে চারটি কুঠরী আছে, আর ধমনী ও শিরা এই দুই রকমের পথ দিয়ে রক্ত চলে। কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে ঐসব রক্ত চলাচলের পথগুলির যোগাযোগ কি, তখনো কেউ তা জানত না। হার্ভে লক্ষ্য করলেন যে, ধমনীতে একটা দরজা আছে, তার মধ্য দিয়ে হৃদয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। কিন্তু সে দরজা দিয়ে ঐ রক্ত হৃদয়ে ফিরতে পারে না। হৃদয় যখন দপ্ দপ্ করে তখন প্রতিবারে ধমনী ফুলে উঠে, আর রক্ত প্রবাহকে একটা করে ধাক্কা দেয়।

অনেক অনুসন্ধানের পর হার্ভে স্থির করলেন যে, যে-রক্ত বাঁদিকের

ব্যাপার নয়—নিতান্তই প্রাকৃতিক দুর্যোগ।' তখন রাজার মন থেকে কুসংস্কার দূর হয়, তবে লোকের মন থেকে নয়।

এই উইলিয়ম হার্ভের নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের তালিকার অন্তর্গত নয়, কারণ তিনি তাঁর সময়কার প্রচলিত ডাইনী-ভীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন। রক্ত চলাচলের রহস্যের আবিষ্কর্তা হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৬২৮ সালে 'Anatomical Dissertation concerning the Motion of the Heart and Blood in animals' নামে পঁচাত্তর পৃষ্ঠার যে পুস্তিকাটি তিনি প্রকাশ করেন সেটি জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছিল।

১৫৭৮ সালে ইংলণ্ডের ফোক্‌স্টোন শহরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে হার্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা টমাস হার্ভে একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি বহুকাল ফোক্‌স্টোন পৌরসভার অল্ডারম্যান ছিলেন এবং পরে মেয়র হয়েছিলেন। তাঁর দশটি সন্তানের মধ্যে তিনটি ছিল কন্যা, আর সাতটি পুত্র। হার্ভে পরিবারটি যেমন সঙ্গতিসম্পন্ন তেমনি সুখী ছিল। দশ বছর বয়সে কিংস স্কুলে ভর্তি হলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই বছরটি স্মরণীয় হয়ে আছে ব্রিটিশ নৌশক্তির কাছে স্প্যানিস নৌবহর পর্যুদস্ত হওয়ার জন্য। পনর বছর বয়সে উইলিয়ম কেমব্রিজের কেন্‌স কলেজে প্রবিষ্ট হলেন। এইখানে পড়বার সময় তিনি আকৃষ্ট হন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি।

কেমব্রিজ থেকে তিনি এলেন পাডুয়াতে। পাডুয়া তখন ইউরোপে একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। এইখানেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন। গ্যালিলিও এবং ভেসালিয়স (১৫১৪-১৫৬৪) এক সময়ে এখানে অধ্যাপনা করতেন। হার্ভে যখন এখানে একজন ছাত্র হয়ে এলেন তখন ভেসালিয়সের কোন প্রভাবই বিদ্যমান ছিলনা, এমন কি শারীরবৃত্ত (Anatomy) সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক কাজ তখন এখানে উপেক্ষিত—শতাব্দীব্যাপী প্রচলিত গ্যালেনের ধারা অনুযায়ী

ছাত্ররা শিক্ষালাভ করত। এজন্য হার্ভে মনে মনে খুব অসুখী বোধ করতেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে এই নিয়ে কোন আলোচনা করতেন না। এখানকার উপাধি লাভ করে তিনি লণ্ডনে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করলেন আর অল্প সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজার চিকিৎসক-রূপে নিযুক্ত হলেন। সেই একই সময় তিনি কেমব্রিজের কলেজ অব ফিজিসিয়ানস-এ প্রবিষ্ট হন।

তিন বছর পরে তিনি উক্ত কলেজের একজন 'ফেলো' (Fellow) নির্বাচিত হন ও সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের অন্যতম চিকিৎসক নিযুক্ত হন। থিওরি অব মেডিসিন সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা দিতেন। অল্পদিনের মধ্যে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হিসাবে হার্ভের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি আপন প্রতিভাবলে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে হার্ভে রাজার চিকিৎসক ছিলেন। অলিভার ক্রমওয়েল তখন প্রধান মন্ত্রী। পার্লামেণ্টে ও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজার বিবাদ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে ১৬৪২ সালে হার্ভে অক্সফোর্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন ও নিজের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ১৬২৯ সালে রাজার শিরচ্ছেদ হওয়ার পর রাজসভার সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে হার্ভের এত উচ্চ স্থান কেন? কিজন্য তিনি এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন? তাঁর আগে থেকেই চিকিৎসকদের জানা ছিল যে হৃদয়ের মধ্যে চারটি কুঠরী আছে, আর ধমনী ও শিরা এই দুই রকমের পথ দিয়ে রক্ত চলে। কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে ঐসব রক্ত চলাচলের পথগুলির যোগাযোগ কি, তখনো কেউ তা জানত না। হার্ভে লক্ষ্য করলেন যে, ধমনীতে একটা দরজা আছে, তার মধ্য দিয়ে হৃদয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। কিন্তু সে দরজা দিয়ে ঐ রক্ত হৃদয়ে ফিরতে পারে না। হৃদয় যখন দপ্ দপ্ করে তখন প্রতিবারে ধমনী ফুলে উঠে, আর রক্ত প্রবাহকে একটা করে ধাক্কা দেয়।

অনেক অনুসন্ধানের পর হার্ভে স্থির করলেন যে, যে-রক্ত বাঁদিকের

কুঠুরি থেকে যাত্রা করল, সেই রক্তই ফিরে এল ডানদিকের কুঠুরিতে, বৃত্তাকারে ব্যাপারটা চলেছে, আর এ প্রক্রিয়ার কোন বিরাম নেই। হৃদয় একটা পাম্পের মতো কাজ করে দেহে রক্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই রক্ত আবার একত্র হয়ে হৃদয়ের ডান দিকের কুঠুরিতে ফিরে আসছে।

অন্য চিকিৎসকেরা হার্ভের কথা একেবারে উড়িয়ে দিলেন, বলেন, হার্ভের মাথা খারাপ হয়েছে। তাঁর রোগীরা পর্যন্ত তাঁকে এক এক করে ছাড়তে লাগল। হার্ভে এ সম্বন্ধে আরো অনেক পরীক্ষা করে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলেন। কিন্তু জনসাধারণ হার্ভের কথাকে কি ভাবে নিল তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। হার্ভে তাঁর পরীক্ষা সাধারণ সভায় সকলকে দেখাবেন বলে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন। যথা সময়ে সভায় উপস্থিত হয়ে হার্ভে দেখলেন যে, সেখানে একটি মাত্র লোক উপস্থিত আছে। যে মুটে পরীক্ষার জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল হার্ভে তাকে উপস্থিত থাকতে বললেন, যাতে তাঁর বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বহু বচনান্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারেন।

রক্ত চলাচল ক্রিয়ার একটা ব্যাপার হার্ভের অনুমানের বিষয় ছিল। রক্ত যে ধমনী থেকে শিরায় যাচ্ছে এটা তিনি কল্পনা করেছিলেন। তখন ক্ষমতাশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র না থাকায় সেটা তিনি পরীক্ষায় দেখতে পাননি। তাঁর পরে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিপন্ন করলেন যে সরু সরু রক্ত-জালিকার মধ্যে দিয়ে এই যোগাযোগ ঘটছে। তখন পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হার্ভের আবিষ্কৃত তত্ত্ব দুটি—

[এক] রক্ত বৃত্তাকারে চলাচল করে।

[দুই] রক্তকে চলাচল করতেই হবে—নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিলেন।

গ্যালিলিও ও হার্ভে প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। বিজ্ঞানের নবযুগের দুই বিভিন্ন দ্বার তাঁরা দুজনে উদঘাটন করেছেন। পৃথিবীর মানুষ এজন্য তাঁদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

এডওয়ার্ড জেনার

(১৭৪৯-১৮২০)

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা। ঐ সময় থেকে আমাদের দেশে বাংলা টিকার চলন উঠে গিয়ে ইংরেজি টিকা দেওয়া শুরু হয়।

'বাংলা টিকা' যাকে বলা হত তা ছিল এই। বসন্ত রোগাক্রান্ত লোকের গুটি থেকে একটু পুঁজ নিয়ে তা একজন সুস্থ মানুষের রক্তে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত। এর ফলে ঐ মানুষটির ভবিষ্যতে বসন্ত রোগ হবার সম্ভাবনা থাকত না। তা থাকত না বটে, কিন্তু ঐ রকম ইনজেক্‌সনের ফলে তখন তার বসন্ত রোগ দেখা দিত। আর সময় সময় তা মারাত্মক আকার ধারণ করত। কিন্তু তবুও তা ছিল মন্দের ভাল। কারণ আগের দিনে বসন্ত রোগ আকছার লোকের মধ্যে দেখা দিত। কেউ কেউ বাঁচত, অনেকে মরত। যারা বাঁচত তাদের দেহের শ্রী-সৌন্দর্য বিনষ্ট হত চিরদিনের মতো। মুখমণ্ডল বসন্তের দাগে ভরে যেত।

যে বাংলা টিকার কথা বলা হল তা এদেশে দেড়শো বছর আগে অবধি চলিত ছিল। কিন্তু কতদিন যাবৎ তা চলে আসছিল সঠিক জানা যায় না। তখন ভারতবর্ষ, তুরস্ক প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন দেশ এ পদ্ধতি জানত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লেডি মণ্টেগু নামে একজন ইংরেজ মহিলা কন্‌স্টান্টিনোপলে বাস করছিলেন, তিনি ওখানে টিকা দেবার ঐ পদ্ধতির কথা অবগত হন, আর নিজের দেশে ফিরে এসে তা প্রবর্তন করবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশের লোকের কাছে সে রকম সাড়া পাওয়া গেল না। কারণ দেখা গেল,

ঐরূপ টিকা দেবার জন্য যে বসন্ত হয় তাতে মাঝে মাঝে শিশুর প্রাণ হানি ঘটে। তা ছাড়া শিশুর দেহের বসন্ত সংক্রামিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে একটু ইতিহাসের কথা বলা যাক। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও, সাংহাই ও মস্কোর জনসংখ্যা একত্রিত করে তার দ্বিগুন সংখ্যাটা হয় ষাট মিলিয়ন—৬০,০০০,০০০। ইউরোপে ১৭০০ থেকে ১৮০০—এই একশো বছরের মধ্যে এই পরিমাণ লোক মারা গিয়েছিল বসন্ত রোগে। ১৭২১ সালে বোস্টনে যখন এই রোগ দেখা দিয়েছিল তখন সেখানকার জনসংখ্যার অর্ধেক মারা গিয়েছিল। এই ভয়াবহ ব্যাধি এখন দুর্লভ বললেই হয়। টিকা (Vaccination) দেবার পদ্ধতির ফলেই পৃথিবী আজ এই ভয়াবহ ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার এই পদ্ধতির আবিষ্কারক।

১৭৪৯,১৭ মে, ইংলণ্ডের গ্লাউমেণ্টারশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন জেনার। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। ছেলেবেলা থেকেই জীববিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ডাক্তার হবেন তিনি—এজন্য স্কুলের পাঠ শেষ করে জেনার ডাক্তারি পড়তে থাকেন যথাসময়ে তিনি ডাক্তারি পাশ করলেন এবং একুশ বছর বয়সে লণ্ডনের সেন্ট জর্জ হাসপাতালে প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক জন হান্টারের অধীনে কাজ করেন। এই চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনার একটি মূল্যবান উপদেশ লাভ করেছিলেন : 'why wonder, why not try an experiment.' তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল।

এডওয়ার্ড জেনার সবে ডাক্তারি পাশ করেছেন। পল্লীগ্রামের মানুষ, তাই পল্লীগ্রামেই তিনি চিকিৎসা ব্যবসার আরম্ভ করেছিলেন একদিন জেনার ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, দেখলেন, একটা শবযাত্রা আসছে, ঘোড়াটাকে রাস্তার এক পাশে রেখে টুপি খুলে তিনি অভিবাদন করলেন। মৃতের স্ত্রী কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, জেনারকে দেখে করুণস্বরে বললেন,—আমার স্বামীর বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়েছে

—আমি কি টিকা নেবার কথা বলিনি ?

—কিন্তু তাতে বিপদ কিছু কমতি ছিল না, দলের মধ্যে একজন উত্তর দিল।

জেনার চিন্তা করতে করতে বাড়ি ফিরলেন।

তাঁর নিজের কথা মনে পড়ল।

টিকা নেবার পর তিনি দেড় মাস যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ রকমের টিকা নেওয়া ছাড়া বসন্ত নিবারণের আর কি কোন সহজ পথ নেই। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি কথাটা ভেবে এসেছেন, কিন্তু কোন কূল-কিনারা পাননি। একজন গোয়ালিনী এক সময় জেনারকে বলেছিল যে তার আর বসন্ত হবার ভয় নেই কারণ তার একবার গো-বসন্ত হয়ে গিয়েছে।

সেই কথাটা জেনারের মনে পড়ে গেল। এর মধ্যে কি কোন সত্য আছে ? গোয়ালিনীদের কারুর মুখে তিনি বসন্তের দাগ দেখেন নি গো-বসন্ত দিয়ে কি তারা এই ভয়াবহ রোগকে এড়িয়ে যাচ্ছে। জেনার চিন্তা করে চলেছেন। সে চিন্তার বিরাম ছিলনা। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের পিছনে থাকে তাঁদের বিরাম বিহীন চিন্তা। নিউটন গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে, চিন্তা করতে করতেই তো আবিষ্কার করেছিলেন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব।

একদিন। সকালবেলায় তাঁর ডিসপেনসারিতে জেনার বসে আছেন। এমন সময় সারা নেল্‌মিস নামে একজন গোয়ালিনী তাঁর কাছে এসে তার হাতটা দেখাল। একটা বড়ো ফোঁড়া হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনার জানলেন যে সেটা গো-বসন্ত। জেনার একটা মলমের ব্যবস্থা করে তাকে বসতে বললেন, তারপর তাঁর যন্ত্র দিয়ে ঐ ফোঁড়া থেকে কিছু পূঁজ সংগ্রহ করলেন। তখনই সংগৃহীত বস্তুট নিয়ে এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জেমস্ ফিপস নামে একটি ছেলেকে টিকা দিতে হবে।

বাড়ির লোক সন্ত্রস্থ। জেনার সকলকে অভয় দিয়ে বল্‌লেন,

আমি আজ এক নতুন ধরনের টিকা দিয়ে যাব, এতে ছেলেটির এখন বসন্ত দেখা দেবে না। অথচ ভবিষ্যতে সে ঐ রোগের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবে। গো-বসন্ত থেকে নেওয়া পুঁজ সঙ্গে ছিল। তিনি তাই দিয়ে টিকা দিলেন। তারপর প্রতিদিন ছেলেটিকে দেখতে আসতেন, ছেলেটির বসন্ত দেখা দিল না। কিছুদিন পরের কথা। সেই পাড়ায় বসন্ত রোগ ভীষণ ভাবে দেখা দিল। বহুলোক প্রাণ হারাল। কিন্তু সেই ছেলেটির কিছু হল না।

আরো পরীক্ষা চাই। দুই বছর ধরে বহু পরীক্ষা করে শেষে ১৭৯৮ সালে জেনার তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন চিকিৎসকগণ জেনারের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। শুধু কি তাই। কাগজে ব্যঙ্গচিত্র বেরুল—গরুর পুঁজ নিয়ে টিকা দেওয়ায় মানুষের মুখ গরুর মতো হয়েছে, শিঙ গজিয়েছে। রয়াল সোসাইটিতে তিনি তাঁর গবেষণা পাঠালেন, অমনোনীত হয়ে তা ফেরৎ এল। এমনই হয়ে থাকে– বহু বিজ্ঞানীর জীবনে এই দৃষ্টান্ত আছে বিনা সমালোচনায় পৃথিবীতে কোন আবিষ্কারই স্বীকৃত বা গৃহীত হয়নি। একালে আইনস্টাইনও তাঁর আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতাবাদ এর একটি বড়ো দৃষ্টান্ত

জেনার কিন্তু দমলেন না।

তিনি তাঁর ছেলেকে তিন তিনবার টিকা দিলেন।

নিক[illegible] একটি গ্রামে অনেক দরিদ্র লোক বাস করত। জেনার তাদের সকলকে টিকা দিয়ে দিলেন। ফলে দেখা গেল সেই অঞ্চলের আর কারো বসন্ত হলো না। তখন ধীরে ধীরে লোকে জেনারের মতে আস্থাবান হতে থাকল, দু'একজন সম্ভ্রান্ত লোক নিজেদের ছেলে মেয়েকে টিকা দেবার জন্য তাঁর কাছে আনতে আরম্ভ করলেন জেনার নেপোলিয়নের বিশেষ প্রিয় হলেন, সম্রাট নিজে টিকা নিলেন লোকের বিশ্বাস বাড়তে থাকে।

একবার যুদ্ধে বন্দী দু'জন ইংরেজকে দেশে ফিরিয়ে দেবার জন্য জেনার নেপোলিয়ানকে আবেদন জানালেন। নেপোলিয়ান দরখাস্ত-

খানা না-মঞ্জুর করতে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁকে স্মরণ করিয়া দেওয়া হল যে, দরখাস্তখানা আসছে টিকার আবিষ্কারক এডওয়ার্ড জেনারের কাছ থেকে। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ বললেন, ঐ ব্যক্তিকে অদেয় আমার কিছু নেই। বলে, ইংরেজবন্দী দুজনকে মুক্তি দিলেন।

এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জেনারের সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট জেনারকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করলেন ও তাঁর পরীক্ষার জন্য ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দিল সম্মানিত ডক্টরেট উপাধি। রাশিয়ার জার দিলেন একটি সোনার আঙটি। ভারতবর্ষ পাঠিয়ে দিল এক লক্ষ টাকা। আর সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হল, যে তারিখে জেনার অষ্টম বর্ষীয় বালক জেম্স ফিপ্সকে প্রথম টিকা দিলেন জার্মানি প্রতি বছর সেই তারিখটি একটি জাতীয় পর্বদিন হিসাবে ধার্য করল। এসবের মধ্যে কিন্তু একটা হাস্যকর ব্যাপার রয়ে গেল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান স্থির করিলেন যে, জেনার যতদিন না গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষা পাস করছেন ততদিন তাঁকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাশ্রেণীভুক্ত করা হবে না। জেনার পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন।

জেনার তাঁর আবিষ্কারের পদ্ধতি কোন কিছু গোপন রাখলেন না। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে নানা প্রশ্ন আসতে লাগল। তিনি যথাযথ ভাবে সকল কথা বুঝিয়ে দিতে থাকলেন। অনেক দেশ আইন করে টিকা নেওয়াটা বাধ্যতামূলক করল। এর পর বসন্ত রোগে মৃত্যু পৃথিবীতে আর বড়ো দেখা গেল না। তাই কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডের একটি বন্দরে একজন নাবিকের বসন্ত হবার সংবাদ যেই প্রকাশিত হল, অমনি চারদিকে এক ভীষণ সোরগোল পড়ে যায়। আর এই আবিষ্কারের একশো বছর আগে ইংলণ্ডের রাণী মেরী যখন এই বসন্ত রোগে মারা যান তখন সেই সময় ইংলণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে মেকলে এই রকম বর্ননা দিচ্ছেন ঃ

প্লেগ অনেক লোকের প্রাণ নাশ করে চলে গেল বটে, কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় প্লেগ মাত্র একবার কি দুবার এসেছে। বসন্ত যেন বারোমেসে ব্যাপার। কবরস্থানে মৃতদেহের পর মৃতদেহ আসছে। প্রত্যেকে ভয়ে অস্থির, কাকে কখন ঐ রোগে ধরে। রোগের আক্রমণ থেকে যাঁরা বেঁচে উঠল তাদের দেহ কি কুশ্রী হল!'

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে অভিযানে বিজ্ঞান জয়ী হল, আর সে অভিযানের নেতা ছিলেন এডওয়ার্ড জেনার। এখানে উল্লেখ্য যে, জেনারের টিকা আবিষ্কারের সূত্র ধরেই আবিষ্কৃত হয় পোলিও ভ্যাকসিন। ১৮২৩, জানুয়ারিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

লুই পাস্তুর

(১৮২২-৮৯২)

জোসেফ মিস্টার নামে একটি ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথে একটা পাগলা কুকুর তাকে কামড়াল। মিস্টারের দেহ ক্ষত বিক্ষত হল। পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়, আর সেই রোগে মৃত্যু অনিবার্য। ছেলেট যে ডাক্তারের কাছে গেল সৌভাগ্যক্রমে তিনি লুই পাস্তুর ও তাঁর আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন। ভদ্রলোক অবিলম্বে ছেলেটিকে পাস্তুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময় পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগ নিবারণের এক সিরাম তৈরি করছিলেন। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না কার উপর ওটা প্রয়োগ করবেন। মিস্টার আসাতে সুবিধা হয়ে গেল, দিনের পর দিন পাস্তুর তাকে ইনজেকসেন দিতে থাকলেন, ছেলেটির জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিল না।

সংবাদটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শুধু ফ্রান্স নয়, ইংলণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের জলাতঙ্ক রোগী প্রতিষেধক সিরাম ইনজেক্সন নেবার জন্য পাস্তুরের পরীক্ষাগারে আসতে লাগল। দূরদেশ থেকে আসার অসুবিধা দূর করতে পাস্তুর তাঁর প্রণালী মতে চিকিৎসার বিভিন্ন কেন্দ্র পৃথিবীর বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে সাহায্য করলেন। জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু থেকে হাজার হাজার লোক রক্ষা পেল। আজ পৃথিবী থেকে ঐ ভয়াবহ রোগ চলে গেছে বললেই হয়। কিন্তু এ হল পাস্তুরের পরিণত বয়সের আবিষ্কার।

ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামটির নাম দোলে (Dole)। সেই গ্রামে ১৮২২ সালের বড়দিন উৎসবের ঠিক দুদিন

আগে লুই পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যোসেফ পাস্তুর ফরাসী সৈন্যদলে একজন সৈনিক ছিলেন। নেপোলিয়ানের পতনের পর তিনি স্বগ্রামে একটি ট্যানারি (Tannery) বা চামড়া তৈরির কারখানা খোলেন। লুই এর জন্মের কিছুকাল পরে পাস্তুর পরিবার আরবয় নামে অপর একটি অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। জায়গাটি খুব দূরবর্তী ছিল না; কিন্তু ঐ স্থানটি ছিল ফ্রান্সের যে অঞ্চলে অপর্যাপ্ত আঙ্গুর জন্মাতো ঠিক তারই মাঝখানে। যোসেফ পাস্তুর এখানে এসেও তাঁর ট্যানারির ব্যবসা করতে লাগলেন আর ম্যাডাম পাস্তুর তত্ত্বাবধান করতেন গৃহস্থলীর যাবতীয় কাজকর্ম।

লুই পাস্তুরের বয়স যখন ষোল বছর তখন যোসেফ ছেলেকে পারিসের একটি মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আর স্কুলের ছাত্রাবাসেই তার থাকার ব্যবস্থা হল। পিতা চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু যোসেফের অভিলাষ ছিল পুত্র ভাল রকম লেখাপড়া শিখে কোন কলেজের অধ্যাপক হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অল্পদিনের মধ্যেই বুঝলেন যে এই ছাত্রটি প্রতিভাবান; তার কল্পনা-শক্তি যেমন প্রখর, বিদ্যার্জনে আগ্রহ তেমনি প্রবল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে বড় হয়ে লুই নিশ্চয়ই একজন কৃতী শিক্ষক হবে। উনিশ বছর বয়সেই তিনি ফ্রান্সের সবচেয়ে ভাল কলেজ থেকে স্নাতক হলেন। তখনই তিনি একজন Student Teacher বা ছাত্র-শিক্ষক হবার সুযোগ পেলেন।

কুড়ি বছর বয়সে তিনি প্রবিষ্ট হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাসায়ন-বিদ্যা ছিল লুইর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। এখানে তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক জে. বি ডুমার অধীনে রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বাইশ বছর বয়সেই তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার অবসরে চলে গবেষণা। দিনরাত তিনি রসায়ন সম্বন্ধে অনুশীলন করে চলেছেন।

তাঁর পিতার আনন্দের অবধি রইল না যখন কয়েকটি মৌলিক গবেষণার জন্য পাস্তুর ডক্টর উপাধি লাভ করেন।

এর পরেই স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আমন্ত্রণ পেলেন; সেখানে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন—তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। এত কম বয়সে অধ্যাপক পদে এর আগে আর কেউ নিযুক্ত হননি এইখানে। স্ট্রাসবুর্গ স্মরণীয় হয়ে আছে পাস্তুরের জীবনে আরো একটি কারণে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর মঁসিয়ে লরেন্ৎ-এর পরিবারেই আশ্রয়লাভ করেছিলেন তরুণ অধ্যাপক। এখানে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। অল্পদিন পরেই লুই তাঁর সুন্দরী কন্যা মেরীর অনুরাগী হয়ে উঠেন। দুই সপ্তাহ পরেই তিনি মেরীর পিতামাতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন, তাঁরা উভয়েই এই প্রস্তাবে সানন্দে মত দিলেন। পাস্তুরের পিতা-মাতাও। ১৮৪৮, ২৯ মে এই পরিণয় কার্য সমাধা হয়। তাঁদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র চার বছর—পাস্তুর ছাব্বিশ, মেরী বাইশ। এই বিবাহ তাঁদের উভয়ের জীবনে সুখের হয়েছিল, শান্তির হয়েছিল। পত্নী হিসাবে মেরী পাস্তুর বহু গুণের অধিকারিণী ছিলেন এবং তিনি সর্বাংশে তাঁর স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন। স্বামীর বিজ্ঞান সাধনায় তিনিই ছিলেন প্রেরণাদাত্রী।

১৮৫৪। লিল্লের (Lille) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস্তুর বিজ্ঞানের ফ্যাকালটির ডীন (Deen) এবং প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ্য। পাউসেট নামে একজন বিজ্ঞানী একটা পরীক্ষা করলেন। তিনি একটি ফ্লাস্ক যুটন্ত জলে পূর্ণ করে মুখটা বন্ধ করলেন। এবার ফ্লাস্কটা উল্টে ধরলেন। একটা পাত্রে পারদ (Mercury) ছিল, মুখটা পারদের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে ছিপিটা খুলে সরিয়ে নিলেন। এইবার তিনি রাসায়নিক পদ্ধতিতে অক্সিজেন তৈরি করে ঐ ফ্লাস্কটির মধ্যে চালিয়ে দিলেন, কিছু জল বেরিয়ে এল। শেষে তিনি গরম চিমটে দিয়ে ধরে একটা খড়ের

টুকরো ঐ ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করালেন। এখন ফ্লাস্কের মধ্যে রইল বিশুদ্ধ অক্সিজেন, ফোটান জল আর জীবাণুশূন্য খড়। কোন রকমে কোন পথ দিয়ে ওর ভিতর জীবাণু ঢুকতে পারে না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল যে ফ্লাস্কের জলটা ঘোলাটে হয়েছে। অণুবীক্ষণে ঐ জলে বহু জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। এই পরীক্ষা থেকে পাউসেট ঘোষণা করলেন যে, একমাত্র জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি হয় প্রচলিত এই ধারণা ভুল, ঐ ফ্লাস্কে জীবাণুরা আপনা হতেই জন্মাল।

তখন লুই পাস্তুর এ-সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করে সুনিশ্চিত হলে যে পাউসেটের সিদ্ধান্ত ভুল। তিনি বিজ্ঞানীদের সম্মুখে পাউসেটের পরীক্ষাটা করলেন। ঘর অন্ধকার করে পাত্রস্থিত পারদের উপর উজ্জ্বল আলো ফেললেন, দেখালেন যে, তার উপর বহু ধূলিকণা রয়েছে। তিনি বললেন যে, ঐসব ধূলিকণাতে আছে জীবাণু, আর যখন ফ্লাস্কের মধ্যে খড় দেওয়া হল তখন ঐ খড়ের সঙ্গে অনেক জীবাণু ভিতরে চলে গেল। তিনি দেখালেন যে ধূলাতে সব সময় জীবাণু থাকে। তিনি বললেন যে বায়ুতে জীবাণু রয়েছে, কোথাও বেশী কোথাও কম। আমাদের বন্ধ শয়নঘরে জীবাণুরা সংখ্যায় অধিক কিন্তু পর্বতের উপরকার বায়ুতে খুবই কম। বহু পরীক্ষা থেকে তিনি এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

ফ্রান্সের বৃহত্তম শিল্প তখন ছিল ব্রুয়ারি (Brewery) বা মদ্য তৈরি করা। সমগ্র ইউরোপে ফ্রান্স তখন এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। ফরাসী সরকারের রাজকোষে এই একটি মাত্র শিল্প থেকেই প্রচুর অর্থাগম হত। এইখানে এসে পাস্তুর যে বিষয়টির রহস্যের উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হলেন, বিজ্ঞানের পরিভাষায় তার নাম Fermentation অর্থাৎ গাঁজন। তাঁর গোড়ার দিকের গবেষণা ছিল ক্রিসটাল (Crystal) নিয়ে। তারপর তিনি টার্টারিক এ্যাসিড নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তখন এক জার্মান রাসায়নিকও

এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলেন। পাস্তুরেরও দৃষ্টি পড়ল বিষয়টির উপর।

এই নতুন গবেষণায় হাত দিয়ে তিনি যে রহস্যের সন্ধান পেলেন, পরবর্তিকালে রসায়নে তা যুগান্তর এনে দিয়েছিল। আঙ্গুর পচিয়ে ফরাসি দেশে মদ তৈরি করা হত। একদিন অধ্যাপক পাস্তুরকে একটি মদ তৈরির কারখানা পরিদর্শন করার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তখন এই শিল্পে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, উৎপন্ন বিয়ারের মধ্যে কতক পরিমাণ নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়, আর অবশিষ্ট একেবারেই অপেয় হয়। কি জন্য এটা তা বোঝা যেতনা, কিন্তু এর ফলে সরকারের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হত। কারখানায় এলেন রাসায়নিক। তাঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দুটি চৌবাচ্চা (Vat) দেখান হল ; তবে একটিতে ছিল উৎকৃষ্ট বিয়ার অপরটিতে নিকৃষ্ট বিয়ার।

পাস্তুর চৌবাচ্চা দুটির মধ্যে হরিদ্রাবর্ণের সফেন পদার্থ টি (yeast) বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। ঐ পদার্থের নমুনা নিয়ে এসে তাঁর ল্যাবোরেটরিতে নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। হঠাৎ তিনি একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করলেন, যা ইতিপূর্বে কেউ লক্ষ্য করেনি। উৎকৃষ্ট চৌবাচ্চা থেকে প্রাপ্ত ঐ হরিদ্রাবর্ণের পদার্থটির আকৃতি ছিল গোলাকৃতি (spherical) আর নিকৃষ্ট চৌবাচ্চার পদার্থটির আকৃতি লম্বাকৃতি (elongated)। এই পার্থক্য থেকে পাস্তুর সিদ্ধান্ত করলেন যে, গেঁজে যাবার সময় চৌবাচ্চার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য পদার্থের মিশ্রণ ঘটে থাকবে, আর তারই ফলে বিয়ার টকে যায়।

কি সেই অদৃশ্য পদার্থ ? গবেষণার ফলে রাসায়নিক এই তথ্যে উপনীত হলেন যে, কোন পদার্থ বিশেষের সংস্পর্শে এই রকম পরিবর্তন ঘটেনি—এটা সম্ভব হয়েছে বাইরের বাতাসের সংস্পর্শেই। আবিষ্কৃত হয় একটি চাঞ্চল্যকর বৈজ্ঞানিক সত্য—বাতাসের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য জীবাণু (microbe)। সঙ্গে সঙ্গে এ যাবৎকাল

প্রচলিত একটি ভ্রান্ত মতবাদের অবসান ঘটল Spontaneous generation থিওরি বাতিল হয়ে গেল। অজৈব পদার্থ থেকে সজীব পদার্থ উৎপন্ন হয়—এই কথাই বিজ্ঞানীরা এতকাল বিশ্বাস করে আসছিলেন। পাস্তুর তাঁর দীর্ঘ দশ বৎসর কাল ব্যাপী একাগ্র গবেষণার ফলে এই প্রচলিত মতবাদের পরিবর্তন ঘটালেন। যুগান্তকারী এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে ১৮৬৪ সালে তাঁর সময়কার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক বলে স্বীকৃত হলেন।

১৮৬৫। সেই সময় ফ্রান্সে গুটিপোকা চাষের খুব চলন ছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসীরা এই ব্যবসায়ে ও রেশমের জিনিস তৈরির কাজে তাদের জীবিকা অর্জন করত। এই বছর ওই গুটি পোকার মড়ক লাগল, রেশম ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার মতো হল। পাস্তুরের উপর ভার পড়ল এর প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করা। এই ব্যবস্থায় গুটিপোকার চাষীর দুঃখিত হল, প্রাণীতত্ত্ব বিশারদদের যে কাজ তার ভার দেওয়া হল কিনা একজন রসায়নবিদকে! পাস্তুর পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, দেখলেন যে বিশিষ্ট রকমের জীবাণু এই উৎপাত ঘটায়। তিনি তাদের চিনলেন, চাষীদের চেনালেন, প্রতিষেধের ব্যবস্থা করলেন, মড়ক থেমে গেল, ফ্রান্সের জাতীয় ব্যবসা পুনরুজ্জীবিত হল। তাইতো হক্সলি বলেছিলেন,—১৮৭০ সালের জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সকে যে পরিমাণ ক্ষতি পূরণ দিতে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা ফ্রান্সের ঘরে এল পাস্তুরের এক আবিষ্কার থেকে।

এই সময় হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তিনি প্রায় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু অদম্য ছিল তাঁর মানসিক বল; ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই তিনি প্যারিসে এসে তাঁর গবেষণা কার্য চালাতে থাকেন। ১৮৬৭ সালে তিনি প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি জীবাণু-তত্ত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করতে থাকেন। পাস্তুরের জীবাণু সম্বন্ধে আবিষ্কারের পর রবার্ট কখ্ (১৮৪৪-১৯১০) নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী অ্যানথ্রাক্স

রোগে মৃত একটি পশুর রক্তে এক বিশিষ্ট রকমের জীবাণু লক্ষ্য করলেন। তিনি সেই জীবাণু ইঁদুর খরগোসের শরীরে ইনজেক্‌সন করলেন, তাদেরও ঐ রোগ দেখা দিল। এখন পাস্তুর এ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, মৃদু রকমের এই জীবাণু যদি কোন পশুর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে তার তখন ওই রোগ খুব স্বল্পভাবে দেখা দেবে, কিন্তু ভবিষ্যতে ওই রোগের মারাত্মক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে কোন আবিষ্কারই বিনা প্রতিবাদে গৃহীত বা স্বীকৃত হয় না। এক্ষেত্রেও তাই হল। পশুশাস্ত্রবিদেরা পাস্তুরের কথা উপহাস করে উড়িয়ে দিলেন, শেষে তাঁরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করবার জন্য পাস্তুরকে আহ্বান করলেন। পাস্তুর সম্মত হলেন। এটাই প্রকৃত বিজ্ঞানের ধর্ম। ১৮৮১। ২ জুন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। প্রচলিত সংস্কার বা পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত-কিসের জয় হবে! পাস্তুরের মতের সমর্থক ও বিরোধী বহু লোক সমবেত হয়েছেন। প্রাণীবিদ্যার, চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষজ্ঞেরা এসেছেন, বহু সাংবাদিকও উপস্থিত।

এর আগে পাস্তুরকে পঞ্চাশটি সুস্থ ভেড়া দেওয়া হয়েছিল, তাদের পঁচিশটিকে তিনি মৃদুটিকা দিয়েছেন, বাকী পঁচিশটার কিছু করেন নি। এর কিছুদিন পরে পঞ্চাশটি ভেড়াকে তিনি তীব্র অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ইনজেক্‌সন করেছেন। ওই দিন বেলা দুটোর সময় পাস্তুর জনমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হলেন। দেখা গেল আগে টিকা দেওয়া হয়নি এমন পঁচিশটির মধ্যে বাইশটি মৃত, তিনটি যায় যায় অবস্থায়, আর টিকা দেওয়া পঁচিশটি ভেড়া সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। বিপুল হর্ষের মধ্যে সন্দিগ্ধ জনমণ্ডলী পাস্তুরের জয় ঘোষণা করল।

পাস্তুরের আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি স্বাভাবিক পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। গাঁজন বা ফার্মেনটেশন সমস্যার সমাধান থেকে তিনি বাতাসের মধ্যে রোগ জীবাণুর সন্ধান পান আর মুরগী-বাচ্ছাদের

কলেরা রোগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুর (microbe) সন্ধান পান। এর থেকেই তিনি অ্যানথ্রাক্সের[1] কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হন। এই সাংঘাতিক অসুখ শুধু গবাদি পশুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মানুষেরও হত।

অবশেষে এল পাস্তুরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। হাইড্রোফোবিয়া বা কুকুরে দংশন করার ফলে জলাতঙ্ক ব্যাধির কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি তিনি কিভাবে আবিষ্কার করেছিলেন সে কাহিনী গোড়াতেই উল্লিখিত হয়েছে। শুধু এই আবিষ্কারের জন্যই তিনি সমগ্র জগদ্বাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অ্যানথ্রাকস ও জলাতঙ্ক ব্যাধির গবেষণা করতে গিয়েই তিনি inocuiation বা রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করানর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পাস্তুরের নাম যে আজ সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত বা তাঁর এই inocculation পদ্ধতির আবিষ্কারের জন্যই। আমাদের মনে রাখতে হবে পাস্তুর কোনদিন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন নি, কিন্তু তিনিই বহু ব্যাধির কারণ নির্ণয় করলেন আর পৃথিবীর মানুষকে তার দূরীকরণের উপায় জানিয়ে দিলেন। ফরাসি দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কে, এ সম্বন্ধে সেই সময় একবার ভোট নেওয়া হয়েছিল। গণনায় দেখা গেল পাস্তুর প্রথম, নেপোলিয়ান দ্বিতীয় ও ভিক্টর হুগো তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

কিন্তু কি অমায়িক ছিলেন এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ১৮৮২ লণ্ডনে চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধীয় এক সর্বদেশীয় সম্মেলন হয়। ফ্রান্স পাস্তুরকে তার প্রতিনিধি করে পাঠাল। অধিবেশন আরম্ভ হবে, সকলে খবর নিচ্ছে, পাস্তুর এসে পৌঁছেছেন কিনা। হলে লোকে লোকারণ্য। দর্শকমণ্ডলীর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পাস্তুর প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর পুত্র ও জামাতা। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে তিনি তাঁদের বললেন—বোধ হয় প্রিন্স অফ ওএলসের আগমনে এই জয়ধ্বনি। আমাদের আগে আসা উচিত ছিল। সম্মেলনের

১। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সংঘাতিক রকমের ফোটকের নাম হল Anthrax (অ্যানথ্রাকস)

সভাপতি পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন,—না, দর্শকমণ্ডলী আপনাকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে।

১৮৯২। পাস্তুরের বয়স সত্তর বৎসর পূর্ণ হল। এর আগে তিনি ফরাসি আকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই দুর্লভ সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সভা থেকে আসতে থাকে অজস্র অভিনন্দন। তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্যারিসে যে উৎসব হয়, তাতে সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। অ্যান্টিসেপটিক সার্জারির আবিষ্কর্তা লর্ড লিষ্টার সেই উৎসব সভায় বলেছিলেন, লুই পাস্তুর তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে পৃথিবীর মানুষের জন্য নীরোগ ও সুস্থজীবনের পথ সুগম করে দিয়ে গেলেন।

১৮৯৫, ২৫ সেপ্টেম্বর, পাস্তুরের মৃত্যু হয়। তাঁর নামে যে গবেষণাকেন্দ্র—পাস্তুর ইনস্টিটিউট ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইখানে তাঁর সমাধি রক্ষিত আছে। এই গবেষণাকেন্দ্রের প্রাঙ্গনে একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে,—একটা কুকুর এক মেষপালক বালককে আক্রমণ করছে, ছেলেটি বাধা দিচ্ছে। আজ যদি সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পাঁচজন বিজ্ঞানীর নাম করতে হয়, তবে নিশ্চয়ই লুই পাস্তুরের নাম তার মধ্যে থাকবে। আর সমগ্র মানবজাতির সবচেয়ে বেশি কল্যাণ সাধন করেছে কে, এ প্রশ্নের উত্তরে পাস্তুরের কথাই বলতে হবে।

———

যোসেফ লিস্টার

(১৮২৬-১৯১২)

পাস্তুর যখন তাঁর নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করছেন লিস্টার তখন গ্লাসগো হাসপাতালে সার্জন বা শস্ত্র চিকিৎসক। এর কিছু পূর্বে শস্ত্র চিকিৎসায় ক্লোরোফরম ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয়েছে, চিকিৎসক এখন ধীরে ধীরে ছুরি চালাতে পারেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কিছুই এগোয়নি। অস্ত্রোপচারের জায়গাটা ঠিক আগের মতোই লাল হয়। ফুলে উঠে রোগীর যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। বহু ক্ষেত্রে তার রক্ত দূষিত হয়ে যায়। মৃত্যুর হার আগের মতোই রয়ে গেল। অস্ত্রোপচার করতে হবে শুনলে রোগীদের মনে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিত।

উনিশ শতকের সূচনাকালে শস্ত্র-চিকিৎসকগণ খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতেন যে, মানুষের শরীরের কোন অংশে অপারেশনের দরুণ যদি কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাহলে রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিকদের মৃত্যুর আশঙ্কা অপেক্ষা ঐ রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা সমধিক। তখনকার দিনে ইউরোপের হাসপাতাল সমূহে অপারেশনের পর রোগীদের মধ্যে গ্যাংগ্রিণ জনিত মৃত্যুর প্রাবল্য রীতিমত বিভীষিকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দৈবক্রমে যদি কোন রোগীর জীবনরক্ষা হত, তাহলেও আজীবন তাকে চিররুগ্ন (Invalid) হয়ে জীবন কাটাতে হত। এই মহামারী এত ঘন ঘন দেখা দিত যে, সকলেই এই সিদ্ধান্ত করতেন যে, অস্ত্রোপচারের অনিবার্য ফলরূপেই এর প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে।

কথাটা মিথ্যা ছিল না। রক্তদুষ্টি-জনিত (Sepsis) মৃত্যুর হার হাসপাতালে এমন ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার বিভাগে উন্নতির পথ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়। সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধ মূল হয়ে গিয়েছিল যে, অস্ত্রোপচার মানেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। আর যে মৃত্যু ছিল ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। মৃত্যু যেন সশরীরে গ্যাংগ্রিণের বেশে রোগীর শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে তার হিমশীতল হাতের স্পর্শ রেখে দিত। তখন চিকিৎসাবিজ্ঞান anesthetics-এর আবিষ্কার হয়েছে এবং এই মূল্যবান আবিষ্কারের ফলে শস্ত্র চিকিৎসকগণ দুঃসাধ্য অপারেশনগুলি করবার জন্য অনেকক্ষণ সময় পেতেন। কিন্তু এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও রক্তদুষ্টি জনিত মৃত্যুর হার কমল না।

চিকিৎসাজগতের এই বিভীষিকা যিনি চিরদিনের মতো লুপ্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর নাম যোসেফ লিস্টার। এ্যান্টিসেপ্টিক সার্জারির, বা অস্ত্রোপচার বিজ্ঞানের জনক বলা হয় এঁকে। যোসেফ এক অতি মার্জিত রুচি, শিক্ষিত এবং সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতি সুন্দর পরিবেশের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর শৈশব ও বাল্যজীবন। পিতা ও পুত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কারণ বিজ্ঞান ছিল তাঁদের উভয়ের সমান আগ্রহ। তাঁর বয়স যখন সবেমাত্র বারো বছর তখনই যোসেফ একজন চিকিৎসক হবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। পিতার সম্মতি ছিল।

পিতার ইচ্ছানুসারে প্রথম দু বছর অধ্যয়নের পর যোসেফ সাহিত্যে স্নাতক হন। তারপর স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫২ সালে তিনি এম. বি. পাশ করলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। কিছুকাল পরেই রয়াল কলেজ অব কার্জনস-এর ফেলোসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কিছুকাল গবেষণার কাজ করেন। গবেষণার বিষয় ছিল

আইরিস—musculature of the iris' অর্থাৎ চোখের যে সূক্ষ্মতম অংশটিকে বলা হয় 'আইরিস' তারই পেশী সমূহের অবস্থান ও ক্রিয়া। এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যোসেফ লিস্টার প্রমাণ করলেন (যা ইতিপূর্বে কোন শারীর বিজ্ঞানী উপলব্ধি করতে পারেন নি) যে, আইরিসের দুটি পেশী আছে যা চক্ষু তারকার প্রসারণ ও সংকোচন ঘটায়। চিকিৎসা সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত পত্রিকায় এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই যোসেফ চিকিৎসা জগতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। 'ডাক্তার যোসেফ লিস্টার'—এই নামটি তখন থেকেই চিকিৎসক সমাজে সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণার বিষয় ছিল ত্বকের অনায়ত্ত পেশী (involuntary muscles of the skin)। এই পেশীর ফলেই মানুষের ত্বকের উপর Grase flesh নামে একপ্রকার দুরারোগ্য চর্মরোগ দেখা দিত। এ গবেষণাতেও ডাক্তার লিস্টার সাফল্য লাভ করলেন। পর পর এই দুটি গবেষণায় সাফল্য লাভ করার ফল এই হল যে, চিকিৎসা জগতে মানুষটি বিশেষভাবেই চিহ্নিত হলেন এবং তাঁর সমসাময়িক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট হল। কিছুকাল তিনি লণ্ডনের একটি হাসপাতালে হাউস-সার্জনের কাজও করেছিলেন। শস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডে তখন যে কয়টি প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলির মধ্যে এডিনবরা মেডিক্যাল স্কুলটি শীর্ষস্থানীয়। ডাক্তার লিস্টার এইখানে এক মাস অধ্যয়ন করার জন্য অনুমতি লাভ করেছিলেন।

অধ্যাপক জেমস সাইমস তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ শস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। এডিনবরাতে এঁরই ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। শীঘ্রই শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং উভয়ে উভয়ের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে এক মাসের অধ্যয়ন একাধিক মাসে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর তাঁকে আমরা দেখতে পাই

এডিনবরার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের হাউস সার্জন রূপে। পরবর্তিকালে তিনি এডিনবরা কলেজ অফ সার্জনস্-এর শস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ডাক্তার লিস্টার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। ১৮৫৬ সালে মিস অ্যাগনেস সাইমস নাম্নী এক তরুণীকে তিনি বিবাহ করেন।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী দুজনে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বেরুলেন। ভ্রমণ উপলক্ষ্যমাত্র ছিল, প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার লিস্টার এই সময় বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালির হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলি পরিদর্শন করে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। অধ্যাপনার অবসরে চলতে থাকে গবেষণার কাজ। আমন্ত্রণ এল গ্লাসগো থেকে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে শস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য। লিস্টার দম্পতি ১৮৬০ সালে চলে এলেন গ্লাসগোতে। এই প্রতিভাধর চিকিৎসকের জীবনের দিক্-পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল গ্লাসগো হাসপাতাল। এইখানেই ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শন করবার সময় তাঁর মনে সর্বপ্রথম প্রশ্ন জেগেছিল এই যে রোগীর দেহে অপারেশন করার গ্যাংগ্রিণজনিত মারাত্মক ক্ষত দেখা দেয়, এর কি কোন প্রতিষেধক নেই? তখন থেকেই এই বিষয়ে কিছু করার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ইউরোপের কোন হাসপাতালেই অপারেশনের সময় যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হত না, কারণ তখনো পর্যন্ত সার্জিকাল হাইজিন বা অ্যান্টিসেপসিল হাইজিনের তথ্য অপরিজ্ঞাত ছিল বললেই হয়। এই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচারের পর রক্তদুষ্টি রোগ (septicaemia) দেখা দিত। তখনো পর্যন্ত অস্ত্রচিকিৎসকগণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ওয়ার্ডের দূষিত-পরিবেশের মধ্যে যে সব রোগজীবাণু রয়েছে তাদের জন্যই অস্ত্রোপচারের পর রোগীর শরীরে রক্তদুষ্টি দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিস্টারও এই ধারণা সমর্থন করতেন। তখন

আইরিস—musculature of the iris' অর্থাৎ চোখের যে সূক্ষ্মতম অংশটিকে বলা হয় 'আইরিস' তারই পেশী সমূহের অবস্থান ও ক্রিয়া। এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যোসেফ লিস্টার প্রমাণ করলেন (যা ইতিপূর্বে কোন শারীর বিজ্ঞানী উপলব্ধি করতে পারেন নি) যে, আইরিসের দুটি পেশী আছে যা চক্ষু তারকার প্রসারণ ও সংকোচন ঘটায়। চিকিৎসা সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত পত্রিকায় এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই যোসেফ চিকিৎসা জগতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। 'ডাক্তার যোসেফ লিস্টার'—এই নামটি তখন থেকেই চিকিৎসক সমাজে সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণার বিষয় ছিল ত্বকের অনায়ত্ত পেশী (involuntary muscles of the skin)। এই পেশীর ফলেই মানুষের ত্বকের উপর Grase flesh নামে একপ্রকার দুরারোগ্য চর্মরোগ দেখা দিত। এ গবেষণাতেও ডাক্তার লিস্টার সাফল্য লাভ করলেন। পর পর এই দুটি গবেষণায় সাফল্য লাভ করার ফল এই হল যে, চিকিৎসা জগতে মানুষটি বিশেষভাবেই চিহ্নিত হলেন এবং তাঁর সমসাময়িক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট হল। কিছুকাল তিনি লণ্ডনের একটি হাসপাতালে হাউস-সার্জনের কাজও করেছিলেন। শস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডে তখন যে কয়টি প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলির মধ্যে এডিনবরা মেডিক্যাল স্কুলটি শীর্ষস্থানীয়। ডাক্তার লিস্টার এইখানে এক মাস অধ্যয়ন করার জন্য অনুমতি লাভ করেছিলেন।

অধ্যাপক জেমস সাইমস তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ শস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। এডিনবরাতে এঁরই ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। শীঘ্রই শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং উভয়ে উভয়ের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে এক মাসের অধ্যয়ন একাধিক মাসে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর তাঁকে আমরা দেখতে পাই

এডিনবরার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের হাউস সার্জন রূপে। পরবর্তিকালে তিনি এডিনবরা কলেজ অফ সার্জনস্-এর শস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ডাক্তার লিস্টার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। ১৮৫৬ সালে মিস অ্যাগনেস সাইমস নাম্নী এক তরুণীকে তিনি বিবাহ করেন।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী দুজনে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বেরুলেন। ভ্রমণ উপলক্ষ্যমাত্র ছিল, প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার লিস্টার এই সময় বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালির হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলি পরিদর্শন করে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। অধ্যাপনার অবসরে চলতে থাকে গবেষণার কাজ। আমন্ত্রণ এল গ্লাসগো থেকে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে শস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য। লিস্টার দম্পতি ১৮৬০ সালে চলে এলেন গ্লাসগোতে। এই প্রতিভাধর চিকিৎসকের জীবনের দিক্-পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল গ্লাসগো হাসপাতাল। এইখানেই ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শন করবার সময় তাঁর মনে সর্বপ্রথম প্রশ্ন জেগেছিল এই যে রোগীর দেহে অপারেশন করার গ্যাংগ্রিণজনিত মারাত্মক ক্ষত দেখা দেয়, এর কি কোন প্রতিষেধক নেই? তখন থেকেই এই বিষয়ে কিছু করার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ইউরোপের কোন হাসপাতালেই অপারেশনের সময় যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হত না, কারণ তখনো পর্যন্ত সার্জিকাল হাইজিন বা অ্যান্টিসেপসিল হাইজিনের তথ্য অপরিজ্ঞাত ছিল বললেই হয়। এই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচারের পর রক্তদুষ্টি রোগ (septicaemia) দেখা দিত। তখনো পর্যন্ত অস্ত্রচিকিৎসকগণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ওয়ার্ডের দূষিত-পরিবেশের মধ্যে যে সব রোগজীবাণু রয়েছে তাদের জন্যই অস্ত্রোপচারের পর রোগীর শরীরে রক্তদুষ্টি দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিস্টারও এই ধারণা সমর্থন করতেন। তখন

তিনি দুইটি রোগীর শয্যার মধ্যবর্তী স্থানের ব্যবধান বৃদ্ধি করে দিলেন। দেখলেন তাতেও রক্তদুষ্টি নিবারিত হল না।

তখন বিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জাগল—এর নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁর মস্তিষ্ক আলোড়িত হতে থাকে এবং তিনি অস্ত্রোপচারের পর রক্তদুষ্টির কারণ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকেন। ক্ষতস্থানে ড্রেসিং করার পদ্ধতি নিয়েও নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তখনোই কুল-কিনারা পান না। ঠিক এমন সময়ে একদিন তাঁর এক সতীর্থ তাঁর কাছে ফরাসী রাসায়নিক লুই পাস্তুরের গবেষণা-লব্ধ ফলের কথা উল্লেখ করেন। সেই জগদ্বিখ্যাত গবেষণার ফলের সূত্র ধরে এইবার অগ্রসর হলেন ডাক্তার লিস্টার।

পাস্তুরের আবিষ্কার থেকে জানা গেল, বায়ুতে যে অগণিত জীবাণু রয়েছে তারাই পচন ঘটায়। এরাই মানুষের অদৃশ্য শত্রু। লিস্টার ভাবলেন, ক্ষতস্থানের পচন হয়ত সেই ভাবেই ঘটে থাকে। তাহলে ঐ সব অদৃশ্য জীবাণুকে বিনাশ করতে পারলে ক্ষতস্থান আর দূষিত হবে না। পাস্তুর এই রকম চিন্তা করে তাঁর পরীক্ষায় ছুরি, ছুঁচ প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করার আগে সেগুলি আগুনে বেশ করে তাতিয়ে নিতেন। কিন্তু পাস্তুর মানুষের গায়ে ছুরি চালান নি, কারণ তিনি চিকিৎসক ছিলেন না। লিস্টার স্থির করলেন তিনি সর্বপ্রথম এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য খুঁজে বার করবেন যা জীবাণুকে ধ্বংস করবে। কার্বলিক অ্যাসিড ঠিক করা হল। হাসপাতালে তাঁর ওয়ার্ডে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য সুফল পেলেন। শস্ত্রচিকিৎসায় এক নতুন যুগ দেখা দিল।

যেমন হয়ে থাকে, সনাতনী দল লিস্টারের পদ্ধতিকে উপহাস করল। কিন্তু লিস্টার তাঁর সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে কাজ করে চললেন। নানা দিকে তিনি তাঁর পদ্ধতির উন্নতি সাধন করতে লাগলেন। যেখানে ক্ষতস্থান আগে থেকে দূষিত হয়েছে সেখানে

তিনি জীবাণু ধ্বংসের ব্যবস্থা করলেন। আর যেখানে তা হয়নি সেখানে ক্ষতস্থানে জীবাণু না আসতে পারে তিনি সেদিকে দৃষ্টি রাখলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে বলতেন যে, তোমরা মনে করবে যেন ঘরের প্রত্যেক জিনিসে কাঁচা রং লাগান হয়েছে। সেখানে তোমাকে যেমন অতি সন্তর্পণে চলাফেরা করতে হয়, এখানেও সেই-রকম ধরে নেবে জীবাণুরা সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। আর তাদের আক্রমণ থেকে ক্ষতস্থান রক্ষা করবে।

হাসপাতালে পাশাপাশি দুটো ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ডে আগেকার মতো চিকিৎসা চলছে, আর লিস্টার তাঁর ওয়ার্ডে তাঁর নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত করেছেন। দেখা গেল লিস্টারের ওয়ার্ডে মৃত্যু আর নেই বললেই হয়। তখন তাঁর সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে থাকল, কিন্তু কি রকম ধীরগতিতে তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার প্রবর্তিত হয় ১৮৬৮ সালে। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ চলল ১৮৭০-৭১ সালে, কিন্তু সে যুদ্ধে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হল না, ফলে দু পক্ষেরই অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারাল। এর পর এল রাশিয়া ও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে জাপান ইউরোপে আবিষ্কৃত শস্ত্র চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করল, কিন্তু রাশিয়া তা করল না, সুতরাং জাপানের লোক ক্ষয় হল অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

পাস্তুর দেখিয়েছিলেন যে, তিনটি উপায়ে রোগ জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব, যথা—Filtration, heat এবং antiseptics এর প্রয়োগ। শেষোক্ত পদ্ধতিটি নিয়ে লিস্টার পরীক্ষা করেছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর তিনি ক্ষত স্থানটি কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে মুছে দিলেন। এর ফলে রক্তদুষ্টি নিবারিত হল বটে, কিন্তু রোগীর ক্ষতস্থানে অসম্ভব জ্বালা অনুভব হত। তিনি তখন কার্বলিক অ্যাসিডের পরিবর্তে অপর একটি রোগ-জীবাণু নাশক বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। অতি ধৈর্যসাপেক্ষ ছিল তাঁর এই গবেষণা।

১৮৬৭। 'দি ল্যান্‌সেট' পত্রিকায় লিস্টার যখন অ্যান্টিসেপ্‌টিক

সার্জারি সম্পর্কে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করলেন তখন ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসা জগতে তুমুল সাড়া পড়ে গেল। বিতর্কেরও সৃষ্টি হল এবং অনেকে এর বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করলেন। ক্লোরোফর্মের আবিষ্কর্তা স্যর জেনস সিমসনই প্রবলভাবে লিস্টারের মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এমনি হয়ে থাকে। পৃথিবীতে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিনা প্রতিবাদে কখনো গৃহীত বা স্বীকৃত হয়নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

ডাক্তার লিস্টার হতাশ হলেন না।

প্রতিপক্ষদের সমস্ত আক্রমণকে উপেক্ষা করে তিনি একাগ্রচিত্তে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। চূড়ান্ত সফলতা এল ১৮৭৯ সালে। ইংলণ্ডের সমস্ত হাসপাতালে লিস্টার উদ্ভাবিত অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক পদ্ধতি গৃহীত হল এবং এর ফলে হাসপাতালগুলির সার্জিকাল ওয়ার্ডের দৃশ্য যেন এক মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সমগ্র ইউরোপে তাঁর গবেষণার জয়ধ্বনি উঠল। লিস্টার প্রবর্তিত পদ্ধতির মূল কথা নিয়ে শস্ত্র চিকিৎসা দিন দিন উন্নতি লাভ করে চলল। এই পদ্ধতি বর্তমানে 'লিস্টার অ্যাণ্টিসেপটিকস' এই নামে পরিচিত।

লিস্টারের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে রবার্ট কথ্‌-এর (১৮৪৩-১৯১০) কথা একটু উল্লেখ করতে হয়। লিস্টার এবং কথ্‌-এঁরাই দুজন ছিলেন পাস্তুরের প্রধান শিষ্য। পাস্তুরের আবিষ্কার পদ্ধতি এঁরাই গ্রহণ করে চিকিৎসা বিদ্যাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করে কথ্‌ পাস্তুরের নির্ধারিত পথে জীবাণু সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিলেন। মানুষের সবচেয়ে ভীষণ অদৃশ্য শত্রুর সম্মুখীন হয়ে পাস্তুর চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে যুগান্তর এনেছিলেন তাকে সম্পূর্ণতা দান করেন কথ্‌। তিনি যক্ষারোগ ও কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষে এসে নানা স্থানে পরীক্ষা করেন, কলকাতার মেডিকেল কলেজেও

তিনি অল্প সময়ের জন্য ছিলেন। কথ্-এর বিশেষ কৃতিত্ব হল রক্ত থেকে জীবাণুকে পৃথক করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা, এবং তিনি তাদের বৃদ্ধির উপায় নির্ণয় করেছিলেন। এইসব কারণে তাঁকে জীবাণু বিদ্যার জনক এবং Death fighter বলা হয়। তিনিই লুই পাস্তুর সম্পর্কে এই সুন্দর উক্তিটি করেছিলেন 'Pastur put microbes on the map'.

১৮৭৯। আমেস্টার্ডেনে সর্বজাতীয় চিকিৎসা কংগ্রেসের এক অধিবেশন হয়। অধিবেশনের সভাপতি ডাক্তার লিস্টারকে অভিবাদন করে বললেন,—আপনাকে শুধু এই সভার অভিবাদন জানাচ্ছি না, যে সব জাতির প্রতিনিধি এযাবৎ মিলিত হয়েছেন, পৃথিবীর সেই সব জাতি আপনাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করল। যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য দেশবাসীর কাছ থেকে তিনি প্রচুর সম্মান লাভ করলেন। তিনি 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হলেন। এর পূর্বে আর কোন চিকিৎসক এ সম্মান লাভ করেন নি। রয়াল সোসাইটি তাঁকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচন করলেন। ১৮৯২ সালে পাস্তুরের সম্বর্ধনা সভায় ইংলণ্ড লিস্টারকে পাঠিয়েছিল। সেই স্মরণীয় সভায় মানব জাতির বিশিষ্ট কল্যাণকারী দুই বিজ্ঞানীর মিলন হয়েছিল। তাঁর অশীতিতম জন্ম দিবসে লিস্টার লাভ করলেন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজসম্মান 'ফ্রীডম অব দি সিটি অব লণ্ডন।'

এইভাবে অস্ত্র চিকিৎসায় যুগান্তর এনে দিয়ে ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পঁচাশী বছর বয়সে লিস্টার পরলোকগমন করেন। লিস্টার আজ নেই, কিন্তু 'লিস্টার অ্যান্টিসেপটিকস্' এই নামের মধ্যে তিনি বেঁচে আছেন।

———

ওয়ালটার রীড

(১৮৫১-১৯০২)

আমেরিকা আবিষ্কারের পর কলম্বস স্পেনের রাজাকে জানালেন যে সেই দেশে এক নতুন রকমের ব্যাধির প্রাদুর্ভাব খুব বেশি।

এই ব্যাধি হল পীতজ্বর ওখানকার প্রধান প্রধান স্থানে ওই ব্যাধি প্রতি বছর এক চতুর্থাংশ অধিবাসীর মৃত্যু ঘটিয়ে আসছিল। আজ বিজ্ঞান এই ভয়াবহ ব্যাধিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে লোপ করেছে বললেই হয়। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আরম্ভ হল এই শতাব্দীর সূচনায়।

ওয়ালটার রীড ১৮৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক চিকিৎসা বিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি উপাধি লাভ করবার পর তিনি সৈন্য বিভাগে একজন ডাক্তার রূপে নিযুক্ত হলেন। অবসর সময়ে তিনি জীবাণু বিদ্যার অনুশীলনী করতেন। এর জন্য তিনি একটি ছোট পরীক্ষাগার স্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে যুক্তরাজ্যের সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ ভাবে টাইফয়েড রোগ দেখা দিল। যুক্তরাজ্য সরকার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি কমিশন গঠন করলেন। রীড এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন।

১৯০০ সালে যুক্তরাজ্য কিউবা দখল করল। কিন্তু দখল করলে কি হবে পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাব এত বেশি যে সে স্থান বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যুক্তরাজ্য সরকার এ রোগ নিবারণের জন্য আর একটি কমিশন নিযুক্ত করলেন, আর রীড এই কমিশনেরও সভাপতি হলেন। কমিশনের সভ্যেরা কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁরা চিন্তা করতে

লাগলেন, কোন্ বাহক এই রোগের জীবাণুকে রোগীর দেহ থেকে সুস্থ লোকের দেহে বয়ে নিয়ে যায়। কিছু আগে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে রোনাল্ড রস-এর অনুসন্ধান প্রকাশিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, এক রকমের মশা ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক। এখানেও কি মশা বা ওই রকমের কোন জীব এই রোগ ছড়াচ্ছে। অনুসন্ধান আরম্ভ হল, মনে হল যেন স্টেগোমায়া জাতীয় জীব এই অনর্থ ঘটায়। কিন্তু নিঃসংশয় রূপে এটা প্রমাণ করা চাই।

পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তে এক রকমের জীবাণু দেখা গিয়েছে। স্টেগোমায়া জাতীয় মশা যদি ওই রোগীকে কামড়ায় তবে ওই মশার দেহে কতকগুলি জীবাণু চলে যাবে। এখন ওই মশার রক্তে জীবাণুরা যদি দ্রুত বেড়ে চলে আর এই অবস্থায় যদি কোন সুস্থ লোককে কামড়ায় তবে সেই লোক পীতজ্বরে আক্রান্ত হবে, এই রকম কল্পনা করা হল। কিন্তু মানুষকে নিয়ে তো পরীক্ষা করতে হবে। কে এই পরীক্ষায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে। এই সত্যানুসন্ধানে কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা আছে যা চিরদিন মানবচিত্তকে অভিভূত করবে।

কমিশনের দুজন সভ্য, জেস ল্যাজিয়ার ও জেম্স ফ্যারল বললেন,—আমাদের উপর পরীক্ষা হোক্। দুজনেই সংসারী, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র আছে। কিন্তু সত্য আবিষ্কারে তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করলেন। স্টেগোমায়া জাতীয় মশা পীতজ্বর রোগীকে কামড়ে কয়েক দিন পরে এদের কামড়াল। দুজনই রোগে আক্রান্ত হলেন, ল্যাজিয়ারের মৃত্যু হল। কিন্তু একটা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে তো কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আরো পরীক্ষা চাই এটাই হল বিজ্ঞানের চিরন্তন রীতি।

কিসেনজার নামে একজন সৈন্য, আর মোরান নামে সেনাবিভাগের একজন করনিক রীতের কাছে এল, বলল,—আমাদের উপর পরীক্ষা হোক।

ওয়ালটার রীড

(১৮৫১-১৯০২)

আমেরিকা আবিষ্কারের পর কলম্বস স্পেনের রাজাকে জানালেন যে সেই দেশে এক নতুন রকমের ব্যাধির প্রাদুর্ভাব খুব বেশি।

এই ব্যাধি হল পীতজ্বর ওখানকার প্রধান প্রধান স্থানে ওই ব্যাধি প্রতি বছর এক চতুর্থাংশ অধিবাসীর মৃত্যু ঘটিয়ে আসছিল। আজ বিজ্ঞান এই ভয়াবহ ব্যাধিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে লোপ করেছে বললেই হয়। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আরম্ভ হল এই শতাব্দীর সূচনায়।

ওয়ালটার রীড ১৮৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক চিকিৎসা বিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি উপাধি লাভ করবার পর তিনি সৈন্য বিভাগে একজন ডাক্তার রূপে নিযুক্ত হলেন। অবসর সময়ে তিনি জীবাণু বিদ্যার অনুশীলনী করতেন। এর জন্য তিনি একটি ছোট পরীক্ষাগার স্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে যুক্তরাজ্যের সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ ভাবে টাইফয়েড রোগ দেখা দিল। যুক্তরাজ্য সরকার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি কমিশন গঠন করলেন। রীড এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন।

১৯০০ সালে যুক্তরাজ্য কিউবা দখল করল। কিন্তু দখল করলে কি হবে পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাব এত বেশি যে সে স্থান বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যুক্তরাজ্য সরকার এ রোগ নিবারণের জন্য আর একটি কমিশন নিযুক্ত করলেন, আর রীড এই কমিশনেরও সভাপতি হলেন। কমিশনের সভ্যেরা কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁরা চিন্তা করতে

লাগলেন, কোন্ বাহক এই রোগের জীবাণুকে রোগীর দেহ থেকে সুস্থ লোকের দেহে বয়ে নিয়ে যায়। কিছু আগে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে রোনাল্ড রস-এর অনুসন্ধান প্রকাশিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, এক রকমের মশা ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক। এখানেও কি মশা বা ওই রকমের কোন জীব এই রোগ ছড়াচ্ছে। অনুসন্ধান আরম্ভ হল, মনে হল যেন স্টেগোমায়া জাতীয় জীব এই অনর্থ ঘটায়। কিন্তু নিঃসংশয় রূপে এটা প্রমাণ করা চাই।

পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তে এক রকমের জীবাণু দেখা গিয়েছে। স্টেগোমায়া জাতীয় মশা যদি ওই রোগীকে কামড়ায় তবে ওই মশার দেহে কতকগুলি জীবাণু চলে যাবে। এখন ওই মশার রক্তে জীবাণুরা যদি দ্রুত বেড়ে চলে আর এই অবস্থায় যদি কোন সুস্থ লোককে কামড়ায় তবে সেই লোক পীতজ্বরে আক্রান্ত হবে, এই রকম কল্পনা করা হল। কিন্তু মানুষকে নিয়ে তো পরীক্ষা করতে হবে। কে এই পরীক্ষায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে। এই সত্যানুসন্ধানে কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা আছে যা চিরদিন মানবচিত্তকে অভিভূত করবে।

কমিশনের দুজন সভ্য, জেস ল্যাজিয়ার ও জেম্স ফ্যারল বললেন,—আমাদের উপর পরীক্ষা হোক্। দুজনেই সংসারী, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র আছে। কিন্তু সত্য আবিষ্কারে তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করলেন। স্টেগোমায়া জাতীয় মশা পীতজ্বর রোগীকে কামড়ে কয়েক দিন পরে এদের কামড়াল। দুজনই রোগে আক্রান্ত হলেন, ল্যাজিয়ারের মৃত্যু হল। কিন্তু একটা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে তো কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আরো পরীক্ষা চাই এটাই হল বিজ্ঞানের চিরন্তন রীতি।

কিসেনজার নামে একজন সৈন্য, আর মোরান নামে সেনাবিভাগের একজন করনিক রীতের কাছে এল, বলল,—আমাদের উপর পরীক্ষা হোক।

—কিন্তু এতে যে কত বড় বিপদ আছে তা তোমরা জানো না।

—যত বিপদই হোক, আপনি পরীক্ষা করুন।

এইরকম পরীক্ষায় কমিশনের সভ্য ল্যাজিয়ার মারা গেছেন।

—আমরা সব জেনেশুনেই এসেছি।

রীড তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন,—তোমরা যখন স্বেচ্ছায় পরীক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছ তখন তোমাদের প্রচুর পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করব।

—পুরস্কারের লোভে আমরা আসিনি।

এই অকপট উক্তি রীডকে স্বভাবতই মুগ্ধ করল। তিনি তাদের ডাকলেন আর টুপি খুলে নতশিরে তাদের অভিবাদন করলেন।

এই পীতজ্বর কি ছোঁয়াচে, রীড চিন্তা করতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা দরকার, আর সে পরীক্ষা তো আগের মতো সমান বিপজ্জনক। কিন্তু সে পরীক্ষা না হলে তো ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা হবে না। যে দুইজন— প্রাইভেট কিসেনজার ও জন জে. মোরান—পরীক্ষার জন্য তাদের জীবন, উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছিল রীড তাদের যখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'But man, do you realize the danger ?'—তখন দুজনেই দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল : 'We volunteer solely for the cause of humanity and in the interest of science'

'মানব সমাজের জন্য আর বিজ্ঞানের স্বার্থে'—অতি সাধারণ দুজনের মুখে এই কথা শুনে রীড, আমরা অনুমান করতে পারি, খুবই মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন আরো একটি বিশেষ কারণে। রীড যখন তাদের পুরস্কার প্রদানের কথা বলেছিলেন, তখন কিসেনজার ও মোরান দুজনেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল যে একটি শর্তে তারা এই ব্যাপারে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে—এজন্য যেন তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হয়।

রীড এইভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। দুইটি পৃথক ঘর

তৈরি হল। একটা ঘর অত্যন্ত অপরিষ্কার, আর সেই ঘরে পীতজ্বরে মারা গিয়েছে এইরকম রোগীর বিছানাপত্র ছড়ান, তবে সে ঘর তারের জাল দিয়ে ঘেরা, কোন মশা ঢুকতে পারবে না। অপর ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে কিন্তু সেই ঘরে একটি জালের বাক্সে কতকগুলি স্টেগোমায়া জাতীয় মশা আছে। মশাগুলি আগে পীতজ্বর আক্রান্ত রোগীকে কামড়েছে। রাতে ওই মশাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

রীড বললেন, আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তবে প্রথম ঘরে যে শোবে তার কিছু হবে না, আর দ্বিতীয় ঘরে যাকে মশা কামড়াবে তার নিশ্চয়ই পীতজ্বর হবে। তিনজন সৈন্য প্রথম ঘরে গিয়ে শুতে থাকল। তাদের একজন মৃতের পায়জামা পরে শুতো। পরপর কুড়ি রাত তারা ওই ঘরে বাস করল। তাদের কিছুই হল না আর যে দুজন আগে পরীক্ষার জন্য রীডের কাছে এসেছিল তাদের মধ্যে মোরান বলে যে ছিল সে এগিয়ে এসে বলল,—আমি ঐ দ্বিতীয় ঘরে শোব। সে সেই ঘরে গেল, গিয়ে নিজেই মশারি বাক্সের দরজা খুলে দিল। মশাগুলি অমনি বেরিয়ে এসে তকে দংশন করল। কয়েক দিনের মধ্যে মোরান দারুণ পীতজ্বরে আক্রান্ত হল। শেষ অবধি সে বেঁচে গেল। রীডের আনন্দের সীমা রইল না।

১৯০০ সালের বড়দিনের সকালে ঘুম থেকে উঠে ওয়ালটার রীড যখন এই সংবাদ জানতে পেরেছিলেন তখন তিনি আনন্দে অস্ফুটস্বরে বলেছিলেন: Thank God! Moran is saved, to live the rest of his life in an obscurity he does not deserve. Sc Moran has his wish—in the interst of science, and for humanity!' তাঁর দিনলিপিতে তিনি লিখলেন; 'The essential factor in the infection of a building with yellow fever is the presence of mosquitees that have bitten cases of yellow fever.'

আর তাঁর স্ত্রীকে একটি পত্রে আবেগমণ্ডিত ভাষায় তিনি লিখলেন ঃ 'বিগত বিশ বৎসর কাল যাবৎ ঈশ্বরের কাছে আমার সর্বক্ষণের প্রার্থনা এই ছিল যে, আমি যেন মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য একটা কিছু করতে পারি। আমার সেই প্রার্থনা অবশেষে মঞ্জুর হয়েছে। নববর্ষের হাজার শুভ ইচ্ছা গ্রহণ কর তুমি।'

সত্য আবিষ্কার হল। পীতজ্বরের কারণ যখন জানা গেল তখন অচিরে তার আক্রমণ রোধ করার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হল। এজন্য যিনি প্রাণ দিলেন সেই ল্যাজিয়ার-এর কথা লোকে ভুলেছে,। যারা প্রাণ দিতে এগিয়ে এসেছিল তাদের কথাও ভুলেছে। কিন্তু তারা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবন রক্ষা করে গিয়েছে। আজ পৃথিবীতে পীতজ্বর নেই বললেই হয়। এই আবিষ্কারের অল্প দিন পরে, ১৯০২ সালে রীড লোকান্তর গমন করেন।

———

রোনাল্ড রস

(১৮৫৭-১৯৩২)

উনিশ শতকের শেষ দশক সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বলা হয়েছে : 'The last ten years of the nineteenth century were as unfortunate for ticks, bugs and gnats as they were glorious for the microbe hunters.' কথাটা মিথ্যা ছিল না। এই সময়েই পৃথিবীর বহু অঞ্চলে বিষাক্ত কীট, ছারপোকা ও মশার প্রাদুর্ভাব ঘটে—বিশেষ করে মশার আক্রমণে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়েছিল। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া ব্যাধি হতো আর সেই ম্যালেরিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবননাশ করত।

পৃথিবীর সর্বত্র ম্যালেরিয়া ছিল, এখনও কোথাও কোথাও অল্প স্বল্প আছে। কিন্তু আজ ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন সুসভ্য দেশে এর প্রকোপ তত বেশি নয়। অবিভক্ত ভারতে প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক জ্বরে মারা যেত, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ছিল ম্যালেরিয়া। সৈন্যদের মধ্যে একটা হিসাবে দেখা যায় যে এক বছর ৩০৫৯২৭ সৈন্যের মধ্যে ১০২৬৪০ জনকে ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান হয়। বিজ্ঞান ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার করল, তার নিবারণের উপায় বলে দিল।

এখানেও লুই পাস্তুর হলেন পথ প্রদর্শক। তাঁর আবিষ্কৃত পথে জার্মানির কখ্ ও ইংলণ্ডের লিস্টার যখন এগিয়ে চললেন, তখন অনেক দেশ থেকে অনেক বিজ্ঞানী পাস্তুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ফ্রান্সে এলেন। পাস্তুরের নিজের দেশের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন লাভেরান।

লাভেরান যখন ফরাসি সৈন্যদের চিকিৎসক হয়ে আফ্রিকায় যান তখন তিনি সেখানে বহু ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করেন। তিনি প্রত্যেক রোগীর রক্তে এক নতুন রকমের জীবাণু লক্ষ্য করেন।

ম্যালেরিয়া কথাটার মানে হল খারাপ বাতাস। তখনকার লোকের ধারণা ছিল জলাভূমির খারাপ বাতাসের জন্য লোকের ম্যালেরিয়া ধরে। লাভেরান দেখলেন, ওসব কিছু নয়, রক্তে এক রকম জীবাণুর আবির্ভাবে এই ব্যাধি ঘটে। এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে, যে শ্রেণীর জীবাণুর জন্য কলেরা যক্ষ্মা প্রভৃতি হয় ম্যালেরিয়ার জীবাণু সে শ্রেণীর নয়।

ম্যানসন নামে একজন চিকিৎসক এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহের রক্তে বাসা বাঁধে। মশা কামড়ালে মশার রক্তে কিছু জীবাণু চলে যায়, সেখানে তারা বাড়তে থাকে, তখন সেই মশা একজন সুস্থ লোককে কামড়ালে তার ম্যালেরিয়া রোগ হয়। মানুষের শরীর হল জীবাণুদের আশ্রয়স্থল, আর মাশারা হল তাদের বাহক। কিন্তু ম্যালেরিয়া সম্পর্কে যাঁর গবেষণা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে স্মরণীয় হয়ে আছে তিনি হলেন স্যার রোনাল্ড রস। ভারত-বাসী এই নামটির সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত।

যে বছর সিপাহী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই ১৮৫৭ সালে হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত একটি শহরে রোনাল্ড রস জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে, রোনাল্ডের পিতা ভারতীয় সৈন্যদলে একজন জেনারেল ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি রেজি-মেন্টের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল রস অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহেই তাঁর আনন্দ ছিল, তবে তিনি ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকতে ভাল বাসতেন। ভারতবর্ষের পরিবেশে পাছে ছেলে মানুষ না হয় সেজন্য রোনাল্ডের বয়স যখন দশ বছর তখন ছেলেকে তিনি ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেন।

লণ্ডনে চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়ন শেষ করে তিনি ভারতীয় চিকিৎসা

বিভাগে (I. M. S.—ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস) চাকরি নেন। এদেশে এসে সাত বছর তিনি মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর, বর্মা থেকে আন্দামান দ্বীপ কর্মব্যপদেশে ঘুরে বেড়ান। সর্বত্রই রোনাল্ড ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখেন। তখন থেকেই তাঁর মনে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে—কৌতূহল থেকে অনুসন্ধিৎসা আর আগ্রহ। তখন তাঁর মনে হল যে, এ-সম্বন্ধে ঠিকভাবে অনুসন্ধান করতে হলে জীবাণু-বিদ্যার বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। এই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করার জন্য তিনি ছুটি নিয়ে ইংলণ্ড যান। ১৮৮৮ সালে প্রথম ফার্লো নিয়ে তিনি যখন লণ্ডন এসেছিলেন তখন ফরাসী সৈন্যবিভাগের শস্ত্র চিকিৎসক লাভেরান ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেছেন। সেই সময় রোনাল্ড তাঁর গবেষণার কাজে যতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন সেই অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখনো পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল যে, লাভেরানের সিদ্ধান্ত ভুল—ম্যালেরিয়ার কোন 'জার্ম' (Germ) নেই। চারটি প্রবন্ধ নিয়ে তিনি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন যে আন্ত্রিক গোলযোগের দরুণ ম্যালেরিয়া হয়।

দ্বিতীয়বার তিনি ছুটি নিয়ে লণ্ডন এলেন ১৮৯৪ সালে। তখন রোনাল্ডের বয়স ছত্রিশ বছর। তাঁর আত্মচরিতে রস্ লিখেছেন: 'I went back to Londan in 1894, plotting to throw up medicine and science. Everything I had tried had failed,...But my failure did not depress me.' অকৃতকার্যতা কখনো কোন বিজ্ঞানীকে হতোদ্যম করতে পারেনি—অনেকের জীবনে এর দৃষ্টান্ত আছে। রোনাল্ডের ক্ষেত্রেও তাই হল। লণ্ডনে এসে তিনি বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক প্যাট্রিক ম্যানসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনিও ম্যালেরিয়ার জীবাণু বিষয়ে নানা গবেষণা করে অকৃতকার্য হন ও চিকিৎসাজগতে উপহাসের পাত্র হন। তাঁর সিদ্ধান্ত—ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহের রক্তে বাসা বাঁধে—গৃহীত

হয়নি। এই দুই অকৃতকার্য গবেষকের মিলন ইতিহাসের অভিপ্রেত ছিল।

ম্যানসন রসকে তাঁর পরীক্ষাগারে নিয়ে এলেন। লাভেরান এবিষয়ে গবেষণা করে যে ফল পেয়েছিলেন— আফ্রিকায় বহু ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে তিনি প্রত্যেক রোগীর রক্তে কেমন করে এক নতুন রকমের জীবাণু লক্ষ্য করেন—সেই সব কথা তিনি রসকে বলেন। তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের কথাও ম্যানসন বিশদভাবে রোনাল্ডকে বোঝালেন। একটি কাচের আধারে রক্ষিত কণামাত্র বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যখন তিনি বললেন : 'That, Ross, is the parasite of malaria—you never find it in people without malaria'—তখন রসের মনে হল এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত।

কিন্তু একটা প্রশ্নের মীমাংসা লাভেরান তখনও পর্যন্ত করতে পারেন নিঃ একজনের শরীর থেকে অন্যের শরীরে রক্ত কিভাবে সংক্রমিত হয়। গভীরভাবে মশার বিষয়টি চিন্তা করতে রোনাল্ড ঠিক করলেন যে, ডাক্তার ম্যানসনের অনুসন্ধান যে পথে গিয়েছে সেই পথ ধরেই তিনি ম্যালেরিয়ার কারণ নিরূপণ করবেন। "এই সমস্যার সমাধান করা আমার কর্তব্য"—এই সংকল্প সেদিন তাঁর মনের মধ্যে জেগেছিল। মশা ম্যালেরিয়ার বাহক ম্যানসনের এই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। পৃথিবীর বুক থেকে এই ব্যাধি নিশ্চিহ্ন করবার একটি অদম্য ইচ্ছা নিয়ে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে রস মশা নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়েছে এই রকমের মশা নিয়ে পরিক্ষা করে দেখলেন, তাদের রক্তে এক বিশিষ্ট রকমের জীবাণু রয়েছে। বাঙ্গালোর হাসপাতালে তাঁর এক সহকারী সাহসের সঙ্গে বলল—'এই মশা আমাকে কামড়াক, আপনি পরীক্ষা করুন দেখুন আমার কি হয়।

পরীক্ষা হল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

রস্ বারবার পরীক্ষা করলেন, কিন্তু প্রতিবারই নিষ্ফল হলেন। তখন তিনি ভাবলেন যে, যে-ধরনের মশা নিয়ে তিনি কাজ করছেন তারা হয়ত ম্যালেরিয়া উৎপন্ন করে না। সেকেন্দ্রাবাদে এসে তিনি এক নতুন ধরনের মশার পরিচয় পেলেন। সাধারণত আমরা কিউলেক্স জাতীয় মশা দেখি, এরা অ্যানোফেলিস জাতীয়। রস তাঁর অনুবীক্ষণ নিয়ে পরীক্ষায় রত হলেন। দিনের বেলায় আটঘণ্টা ধরে কাজ করে চলেছেন, প্রচণ্ড গরম, চারিদিকে মশামাছির ভীষণ উৎপাত। কিন্তু পরীক্ষার বিরাম নেই।

১৮৯৫, ২০ আগস্ট। তখন মাত্র আর দুটো মশা বেঁচে আছে; এর চারদিন আগে এক ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়েছে। বিকাল বেলা, চোখ ক্লান্ত, দেহ অবসন্ন। মশাটাকে ব্যবচ্ছেদ (dissect) করে তার পাকস্থলী পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তাতে নতুন পদার্থ তিনি লক্ষ্য করলেন, যা আগে তিনি কোনদিন দেখেন নি। কিন্তু সেদিন তিনি এত ক্লান্ত, আর আগে এত বেশিবার তিনি হতাশ হয়েছেন যে এর মূল্য তখন তিনি বুঝলেন না। বাড়ি ফিরে গেলেন, আর ঘণ্টা খানিক ঘুমিয়ে নিলেন। ঘুম থেকে উঠে তাঁর মনে হল তিনি এক বিরাট সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

রস্ কবিতা রচনা করতে পারতেন, আনন্দে তিনি এক কবিতা লিখলেন।

I have found thy secret deeds
    Oh, million mudering death
I know that this little thing
    A million men will save—
Oh, death, where is thy sting ?
    Thy victory, O Grave !

ব্যাধির কারণ যখন জানা হল তখন একে দূর করার প্রধান প্রধান উপায় খুঁজে বের করা হল। প্রথম কুইনিন খাইয়ে যতটা পারা যায় ম্যালেরিয়া রোগীকে আরোগ্য করা হতে থাকল, তারপর ওই বাহক অ্যানোফেলিশ মশাকে নির্মূল করার ব্যবস্থা হল। এদের ভাল করে চেনা হল। এদের জীবন ইতিহাস জানা গেল। ডিম থেকে আরম্ভ করে কীট অবধি বিভিন্ন অবস্থায় এদের শেষ করে ফেলতে নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হল। ফলাফল কি হল কয়েক জায়গার ইতিহাস থেকে তা বোঝা যাবে।

রস এর প্রবর্তিত পথে কাজ করে, ইটালিতে, যেখানে বছরে ম্যালেরিয়া জনিত অসুখে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ষোল হাজার, সাত বছরে তা কমে এসে চার হাজারে দাঁড়াল। গ্রীসের ম্যারাথনে মৃত্যুর হার শতকরা আটানব্বুই থেকে দুইতে নামল। পৃথিবীর নানা স্থানে গড়ে উঠল স্বাস্থ্যনিবাস, যে স্থানগুলি আগে ছিল 'সাদা মানুষের কবর'। যুক্তরাজ্যের প্রয়োজন হল পানামা খাল কাটা কারণ এ হলে সে তার রণতরী সহজে পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে চালন করতে পারবে। খাল কাটার জন্য যুক্তরাজ্যসরকার লোকলস্কর পাঠাল।

কিন্তু কাজ কিছুই এগোলনা।

কারণ সেখানে ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাব এত বেশী যে, যে-কেউ সেখানে যায় বিছানা নেয়। যুক্তরাজ্যসরকার তখন এঞ্জিনিয়ারদের দেশে ফিরিয়ে আনল। পাঠাল ডাক্তার। ডাক্তারেরা সেখানে ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর নিবারণের যথাযথ ব্যাবস্থা অবলম্বন করল। সেইজন্য একটা প্রবাদ আছে যে, পাস্তুর পানামা খাল কাটলেন আর রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জাপানকে জেতালেন লিষ্টার।

এ আবিষ্কার ভারতবর্ষে হলেও এখনও ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে আছে। এখনও এই দেশে প্রতি বছর বহু লোক ম্যালেরিয়া রোগে মারা যায়, আর মারা যায় যত লোক তার আট গুণ লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে। যারা ভোগে তাদের কর্মশক্তি কমে যায়, জীবনে অবসাদ

আসে। শুধু মানবতার দিক থেকে নয়, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে স্বাধীন ভারতের সর্ব-প্রধান কাজ হবে দেশ থেকে এই রোগকে একেবারে দূর করা।

রস্‌কে তাঁর আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি নাইট উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। সুইডেনে গিয়ে রাজা গুস্টভের হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করার সময় রোনাল্ড রস্‌ যে ভাষণ প্রদান করেন তার এক স্থলে তিনি বলেছিলেন : 'The march of science will never stop. The facts of science are greater than the little men who find those facts.' এই তো বিজ্ঞানীর উপযুক্ত কথা। পৃথিবীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাই আজো অব্যাহতভাবে চলেছে। অনুসন্ধানের শেষ নেই, গবেষণার বিরতি হবে না কোন দিন।

১৯৩২ সালে স্যর রোনাল্ড রস দেহত্যাগ করেন।

———

আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং

(১৮৮১-১৯৫৫)

'It is the glory of a good bit of work that it opens the way for better things and thus rapidly leads to its own eclipse. The object of research is the advancement of knowledge.' অর্থাৎ, 'একটা সামান্য ভাল কাজের গৌরব এই যে, এর ফলে অধিকতর ভাল কাজের পথ প্রশস্ত হয় এবং এইভাবে প্রথম উদ্যমটি রাহুগ্রস্ত হয়ে যায়। গবেষণার উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি।'

এই কথা বলেছেন পেনিসিলিনের আবিষ্কারক স্যর আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং। তাঁর এই উক্তির সূত্র ধরে আমরা এই বিজ্ঞানীর জীবনকথা ও তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি। ১৮৮১, ৬ই আগস্ট স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত লক্‌ফিল্ড ফার্ম নামক ছোট্ট শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার তিনি সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। ভাই-বোন মিলে তাঁরা আটজন ছিলেন। আলেকজেণ্ডারের বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন তাঁর বাবা হিউগ ফ্লেমিং মারা যান। তাঁর ছিল ক্ষেত-খামার। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস ফ্লেমিং ক্ষেত-খামার দেখতেন। তাঁর নিজের চারটি সন্তান আর চারটি সৎ-ছেলে—এই বৃহৎ পরিবার তিনি দক্ষতার সঙ্গেই পালন করতেন। সদা প্রফুল্লময়ী আর কঠিন চরিত্রের এই নারী তাঁর স্নেহ মমতার ভাণ্ডার যেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটির উপর উজার করে দিয়েছিলেন। 'আজ আমি যা হয়েছি, সেজন্য আমি মায়ের কাছেই সব চেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ।' আলেকজেণ্ডারের এই অকপট উক্তি থেকে তাঁর মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

দশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আলেকজেণ্ডার নিকটবর্তী একটি স্কুলে পড়াশুনা করেন। তারপর তাঁকে চার মাইল দূরবর্ত্তী ডার্ভেল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়, সেখানে তাঁর অন্যান্য ভাইরাও পড়ত। এই বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করবার সময় কিশোর আলেকজেণ্ডার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চার দিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিরীক্ষণ করতেন। পড়াশুনার ভাল ছিলেন, তাই বার বছর বয়সে এই স্কুলে পাঠ শেষ করে তিনি কিলমারনোক আকাদেমিতে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে ষোল বছর বয়সে আলেকজেণ্ডারকে স্কুল পরিত্যাগ করতে হয়। অতঃপর তিনি একটি জাহাজ কোম্পানীতে চাকরি নিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে বেশি দিন চাকরি করতে হয়নি। ১৯০১ সালে তিনি একটি সম্পত্তির কিছু অংশ লাভ করেন। আবার স্কুলে প্রবিষ্ট হলেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করবেন ঠিক করেন।

সেণ্ট মেরি মেডিক্যাল স্কুলে তিনি ভর্তি হলেন। এইখানে ব্যাকটিরিওলজির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার আলম্রথ রাইট। ফ্লেমিং ছাত্র হিসাবে তাঁর খুব প্রিয় ছিলেন; অন্য দিকে অধ্যাপক রাইটও প্রিয়দর্শন ও মেধাবী এই ছাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কলেজে তিনি অনার্স ছাত্র ছিলেন। কলেজের রেকর্ডস্ থেকে জানা যায় যে, ক্লাসে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছাত্র বলে গণ্য হয়েছিলেন এবং চিকিৎসাবিদ্যার প্রত্যেকটি বিষয়ে—ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি ও প্যাথোলজি—তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। সমস্ত পারিতোষিকগুলি তিনিই লাভ করেছিলেন। কিন্তু ফ্লেমিং গ্রন্থকীট ছিলেন না। তিনি বন্দুক ছোঁড়া, সাঁতার কাটা ও ওয়াটার পোলো খেলাতেও সমান পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কি কলেজের নাট্যানুষ্ঠানেও তিনি অংশ গ্রহণ করতেন।

১৯০৬। ফ্লেমিং এর বয়স এখন পঁচিশ বছর। চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হয়ে তিনি লণ্ডনে সেণ্ট মেরি হাসপাতালে গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। ডাক্তার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং তাঁর অধ্যাপক আলম্রথ

রাইটের অধীনেই এই কাজে, ব্রতী হলেন। ডাক্তার রাইট কেবলমাত্র ব্যাকটিরিওলজির অধ্যাপক ছিলেন না, তিনি মানব দেহের রক্তের শ্বেতকণিকা (phagocyte) সম্পর্কে গবেষণা করেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পাস্তুর জীবাণু আবিষ্কার করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে এগুলি আমাদের চারদিকে রয়েছে, শরীরের মধ্যে সর্বদাই অধিষ্ঠান করছে এই অদৃশ্য জীবাণু। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি করলেন যে, আমরা যে বাতাস গ্রহণ করি, যে খাদ্য ও জল গ্রহণ করি তার ভিতর দিয়ে 'এরা আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এমন কি শরীরের কোন অংশ যদি হঠাৎ কেটে যায় বা ভেঙে যায় অমনি সেই ছিদ্র পথ দিয়ে এরা শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাহলে এই অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে আমরা মারা যাই না কেন?

এর কিছুটা উত্তর পাওয়া গিয়েছিল প্যারিসে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের ডাক্তার এলি মেসনিকফ্-এর গবেষণালব্ধ তথ্যের মধ্যে। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, রক্তের মধ্যে যেসব শ্বেতকণিকা—(phagocyte) আছে সেগুলি জীবন্ত ও শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবাণুগুলিকে গিলে ফেলে সম্পূর্ণ ভাবেই হজম করে থাকে। অন্যদিকে জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ্ (১৮৪৩-১৯১০) তাঁর গবেষণালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে ঘোষণা করলেন: 'The blood fluid itself had the power to kill bacteria.' এই দুইটি মতবাদের ফলে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তার সমাধান হল ডাক্তার রাইটের গবেষণায়। তিনি মানবদেহের শরীরে প্রবাহিত শোণিত ধারার মধ্যে একটি নতুন গুণ আবিষ্কার করলেন। তার নাম দিলেন 'অপশোনিন' (opsonin)। এই আবিষ্কারের ফলে একটি নতুন ধরনের ওষুধের আবির্ভাব প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছিল এবং জীবাণু ঘটিত ব্যাধি সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হয়েছিল। ফ্লেমিং এই রকম পরিবেশের মধ্যেই তাঁর গবেষণার কাজ একাগ্রমনে করে যাচ্ছিলেন।

১৯২৮। সেন্ট মেরি হাসপাতালে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন

ডাক্তার ফ্লেমিং। একটা কাচের পাত্রে আগার (Agar) নামে জেলি রেখে তিনি একজন মানুষের ফোড়া থেকে কিছু পুঁজ নিয়ে সেই জেলির উপর চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। পুঁজে স্টাফিলককস জীবাণু থাকে, আর আগার জেলি হল জীবাণুদের খাদ্য, জেলির উপর পড়ে তারা হু হু করে বেড়ে যেতে থাকল। পাত্রে এক এক জায়গায় তারা দলবদ্ধ হচ্ছে। ফ্লেমিং লক্ষ্য করে চলেছেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, এক জায়গায় একটা নীলাভ ছাতা পড়েছে। ওই জায়গাটা তত পরিষ্কার ছিল না, এই রকম তো মনে হবার কথা। কিন্তু ফ্লেমিং ওটাকে ফেলে না দিয়ে সরিয়ে রাখলেন, পরে দেখবেন ওখানে কি ঘটে।

এইখানেই রইল ভবিষ্যৎ কালের চিকিৎসাজগতের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। কেবলমাত্র কৌতূহল বশে ফ্লেমিং ওটাকে রেখে দিলেন, শেষ অবধি এই কৌতূহলই ফ্লেমিংকে পুরস্কৃত করল। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যেখানে ব্যাঙের ছাতা পড়েছে তার চারদিকের জীবাণুরা পাত্রের অন্য জায়গার জীবাণুর মতো সতেজ নেই। তবে কি ওই ছাতা ওই স্থানের জীবাণুকে ধ্বংস করবার চেষ্টায় আছে। এই রকম যদি হয় তবে শুধু কি পাত্রস্থিত আগারে তা ঘটবে। মানুষের দেহে কি এই রকম ঘটতে পারে না। ফ্লেমিং চিন্তা করতে লাগলেন। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান চলতে থাকল। দেখা গেল মানবদেহেও সেই রকমই হয়। তবে তো এক রকমের জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল যারা আমাদের এই অদৃশ্য শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে। এরা তো তবে আমাদের অদৃশ্য মিত্র। তখন বিজ্ঞানী কি করলেন? তিনি ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙবার ব্যবস্থা করলেন।

স্ট্যাফিলককস ছাড়া অন্য জীবাণুতে কি এরকম সম্ভব। পরীক্ষা চলল। দেখা গেল, কেউ স্ট্যাফিলককসের মতো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হল, কারও বা বৃদ্ধির হ্রাস হল, আবার অপর জীবাণুর কিছু হল না। এই ছত্রাক সব রকম জীবাণুর শত্রু নয়। তা না হোক, এক শ্রেণীর

জীবাণুকে যদি বধ করতে পারে তবে সে তো আমাদের পরম লাভ। পরীক্ষায় দেখা গেল ছত্রাক সোজাসুজি জীবাণুকে মেরে ফেলে না। এরা জীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ করে, শেষ অবধি শ্বেতকণিকারা তাদের নাশ করে। আগে শ্বেতকণিকারা জীবাণুদের সামলাতে পারছিল না, এখন এই ছত্রাক বন্ধুভাবে শ্বেতকণিকার সঙ্গে মিলল।

এইবার ছত্রাক থেকে এই অদৃশ্য মিত্রদের পরিষ্কৃত ভাবে পাবার চেষ্টা চলল। রসায়ন বিদেরাও একাজে যোগ দিল। শেষ অবধি বিশুদ্ধ আকারে তা পাওয়া গেল। আর পেনিসিলিয়ম নোটেটম জাতীয় ছত্রাক থেকে পাওয়া যাওয়ায় ফ্লেমিং এর নাম দিলেন 'পেনিসিলিন'। ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মকালে সেন্ট মেরি হাসপাতালের একটি স্বল্প পরিসর স্যাঁৎসেতে ল্যাবোরেটরিতে এই যে যুগান্তকারী একটি আবিষ্কার হল, ঘটনাচক্রে তা আর বেশি দূর অগ্রসর হল না। তার কারণ ঠিক এই সময় জার্মানিতে প্রণ্টোসিল বলে এক নতুন ওষুধ বেরুল, আর এই প্রণ্টোসিলের রোগ সারাবার ক্ষমতা দেখে পৃথিবীর চিকিৎসকগণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেখা গেল ককাই জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করতে এর ক্ষমতা অসাধারণ। তা ছাড়া কয়েকটি সাধারণ দ্রব্য মিশিয়ে একে তৈরি করা যায়, সেজন্য দামেও খুব সস্তা।

জার্মানির এই আবিষ্কারের পর ইংলণ্ডের রসায়ন বিদের এ বিষয়ে মন দিলেন আর অনতিকালের মধ্যে সালফাড্রাগ' নামে এই শ্রেণীর ওষুধে বাজার ছেয়ে গেল। এই কারণে লোকে পেনিসিলিনের কথা ভুলে রইল, তা ছাড়া পেনিসিলিন তৈরি খুব শ্রম সাধ্য ব্যাপার, কাজে কাজেই দামও বেশি। কিন্তু একথা সত্য যে, অ্যান্টিবায়েটিক্স-এর ক্ষেত্র প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন ফ্লেমিং তাঁরই আবিষ্কারের সূত্র ধরে পৃথিবীর মানুষ পেয়েছে স্ট্রেপটোমাইসিন, অরিয়মাইসিন ও টেরামাইসিন প্রভৃতি বিখ্যাত ওষুধ। দশ বছর বাদে বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাগিদে পেনিসিলিন সম্বন্ধে সজাগ হলেন। এই যুদ্ধে পেনিসিলিন ব্যবহার করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসংখ্য সৈন্যের প্রাণ

বাঁচান সম্ভব হয়েছিল। 'In war penicilin saved countless lives. In peace time penicilin has saved countless more.' এই আশ্চর্য ওষুধ সম্পর্কে এই উক্তিটি করেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট জীবাণু গবেষক ডাক্তার ই. বি. চেন। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য ফ্লেমিং নোবেল পুরস্কার ও 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি জীবাণুর গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

জগদীশচন্দ্র বসু

(১৮৫৮-১৯৩৭)

'Where will you find another seientist in all India to place by the side of Dr. J. C. Bose or Dr. P. C. Ray ?' এই উক্তি করেছিলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে যিনি ছিলেন আমাদের জাতীয় জাগরণ তথা জাতীয় কংগ্রেসের আদিপর্বের একজন বিশিষ্টতম নেতৃপুরুষ। কথাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য, কারণ তিনি যে সময়ের কথা বলেছেন তখন ভারতবর্ষে, দীর্ঘ কাল পরে, বিজ্ঞানের আলোক বর্তিকা জ্বালিয়ে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই দুজনকেই আমরা আধুনিক ভারতবর্ষে বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রবর্তক বলতে পারি। তাঁরাই নাগার্জুন, কণাদ, আর্যভট্টের প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়ে ভারতবর্ষকে বিশ্ববিজ্ঞান সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে উন্নীত করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞানলক্ষীর বরপুত্র।

১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এই দেশে সবেমাত্র সিপাহী যুদ্ধ শেষ হয়েছে। একটি সহজাত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়েই তাঁর জন্ম হয়েছিল ; তাঁর শৈশব কালেই এর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ষোল বছর বয়সে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জগদীশচন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবিষ্ট হন। তখন থেকেই তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প ড়েন। যথাসময়ে স্নাতক হয়ে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত গম ন করেন। পিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি ডাক্তারি পড়তেই গিয়েছিলেন ? কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্য রকম। ডাক্তারি পড়া

ছেড়ে কেমব্রিজে গেলেন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য? প্রায় চার বছর বিলেতে থাকার পর, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Tripos এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮৫ সালে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক পদে যখন তিনি নিযুক্ত হন তখন জগদীশচন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। তিন বছর পরে তিনি ঐ পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভাল অধ্যাপক হিসাবে তখন তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করবেন তিনি—এই রকম সংকল্প নিয়েই তিনি বিলাত থেকে ফিরেছিলেন। ১৮৯৪ সালের নভেম্বরে তাঁর ৩৫ তম জন্মদিনে জগদীশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেন: 'অতঃপর আমি আমার জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসর্গ করব।' তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে এই দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা করেন।

এ দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ হলেও প্রেসিডেন্সি কলেজেও তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ছিল না। উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে ইচ্ছামত পরীক্ষা করার বা মৌলিক গবেষণা করার সুবিধা ছিল না। জগদীশচন্দ্র কিন্তু তাতে দমলেন না। তিন মাসের মধ্যে তিনি দেশী কারিগরদের দিয়ে নিজ প্রয়োজনরূপ স্বপরিকল্পিত একটি যন্ত্র তৈরি করিয়ে তাঁর ঈপ্সিত গবেষণা শুরু করে দিলেন। ঐ সময় 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ সম্ভব জগৎ' সম্বন্ধে নানা চিন্তা তাঁর মাথায় অহরহ ঘুরছিল। তিনি সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

অচিরেই ফল পাওয়া গেল। ১৮৯৫। জগদীশচন্দ্র কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। এই গবেষণার বিষয় ছিল—বিদ্যুৎরশ্মির দিক্ পরিবর্তন। এই সময়েই নিয়োলাইট, সার্পেনটাইন প্রভৃতি পাথরের বৈদ্যুতিক কম্পন পরিবর্তন করার শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিছুকাল পরে

লণ্ডনের The Electrician নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের দুইটি দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের শেষ দিকে বিলাতের রয়াল সোসাইটি তাঁর গবেষণা ফল প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐ সময় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কোন পরীক্ষা না নিয়েই তাঁকে D. Sc. (বিজ্ঞানাচার্য) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

১৮৯৬। জগদীশ চন্দ্র তাঁর গবেষণার ফল প্রচারের জন্য এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সস্ত্রীক বিলাত গেলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার কিছু কাল পরে অবলা বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। লেডি বসুও একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম বিজয়-অভিযান। সেখানকার বিজ্ঞানীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ঐ বছর লিভারপুলের ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের একটি বিশেষ অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্বন্ধীয় তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাদি দেখাবার সুযোগ পেলেন। এইখানেই বিলাতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী বৃদ্ধ লর্ড কেলভিন তাঁর কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

বিলাতের পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় বিজ্ঞানীর আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ প্রকাশিত হল। লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউসন থেকে তিনি আমন্ত্রিত হলেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। এখানে বক্তৃতা দেওয়ার পর জগদীশচন্দ্রের মর্যাদা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। তিনি ফ্রান্স ও জার্মানি থেকেও অনুরূপ নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। প্যারিসের বিজ্ঞান-পরিষদে তিনি যে বক্তৃতা করেন সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন পরিষদ সভাপতি ম'সিয়ে কর্ণু স্বয়ং। বার্লিনের পদার্থ-বিজ্ঞানীরা নয়, হাইডেলবার্গ প্রভৃতি দূর প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বহু জার্মান অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বার্লিনের

প্রখ্যাত অধ্যাপক ভারবুর্গ এই সময় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে একজন গবেষণাকারীকে বলেছিলেন: 'ডক্টর বসু যা করেছেন, তারপর তোমাদের আর বিশেষ কিছু করবার থাকল না।'

১৮৯৭, এপ্রিল মাস। জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর জয়মাল্য মাথায় নিয়ে। দেশে ফিরে তিনি কোন রকম বিশ্রামের কথা চিন্তা না করেই কলেজের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গবেষণাও চালিয়ে যেতে থাকেন। এই শতাব্দীর সূচনায়, ১৯০০ সালে প্যারিসের মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে বিজ্ঞানীদের যে মহাসভা বসে, ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে সে মহাসভায় যোগ দেওয়ার সুযোগ দেন। এটাই ছিল তাঁর দ্বিতীয় বারের অভিযান। এই আন্তর্জাতিক মহাসভায় তিনি 'জীব ও জড় পদার্থের উপর বিদ্যুৎরশ্মি-পাতের ফলের ক্ষমতা' সম্বন্ধে একটা চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই ছিল তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা।

তাঁর এই গবেষণার মূল কথা সংক্ষেপে এইভাবে বলা যেতে পারে। আমরা জানি, জড়ই শক্তির লীলাভূমি আর এই জড়কে আশ্রয় করেই শক্তির প্রকাশ হয়ে থাকে। জড়ের উপর শক্তির কার্যের পরিধি অসীম হলেও, প্রত্যেক কার্যের মূলে পৌঁছলে দেখা যায়, পদার্থের অণুগুলির বিন্যাস বিকৃত ও চঞ্চল করাই শক্তির একটা বড় কাজ। জড় ও শক্তির এই বিশেষ সম্বন্ধটা অবলম্বন করে জগদীশচন্দ্র জীবনক্রিয়ার রহস্য (Mysteries of life) সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি গাছপালার নানা রকমের অঙ্গসঞ্চালন পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, গাছপালা বাইরে থেকে যে তাপ ও আলো পায়, সেই তাপ ও আলোরূপী শক্তিই তাদের দেহের অণুসহা বদলে দিতে থাকে—অণুগুলোকে বিকৃত করে তাদের দেহকে বেঁকিয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে গাছপালার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অণুগুলো একই শক্তি প্রয়োগে একইভাবে উত্তেজিত হয় না এবং এই ব্যাপারটার উপরই গাছপালার নড়াচড়া নির্ভর করে।

লণ্ডনের The Electrician নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের তুইটি দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের শেষ দিকে বিলাতের রয়াল সোসাইটি তাঁর গবেষণা ফল প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐ সময় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কোন পরীক্ষা না নিয়েই তাঁকে D. Sc. (বিজ্ঞানাচার্য) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

১৮৯৬। জগদীশ চন্দ্র তাঁর গবেষণার ফল প্রচারের জন্য এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সস্ত্রীক বিলাত গেলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার কিছু কাল পরে অবলা বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। লেডি বসুও একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম বিজয়-অভিযান। সেখানকার বিজ্ঞানীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ঐ বছর লিভারপুলের ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের একটি বিশেষ অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্বন্ধীয় তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাদি দেখাবার সুযোগ পেলেন। এইখানেই বিলাতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী বৃদ্ধ লর্ড কেলভিন তাঁর কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

বিলাতের পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় বিজ্ঞানীর আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ প্রকাশিত হল। লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউসন থেকে তিনি আমন্ত্রিত হলেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। এখানে বক্তৃতা দেওয়ার পর জগদীশচন্দ্রের মর্যাদা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। তিনি ফ্রান্স ও জার্মানি থেকেও অনুরূপ নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। প্যারিসের বিজ্ঞান-পরিষদে তিনি যে বক্তৃতা করেন সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন পরিষদ সভাপতি মঁসিয়ে কর্ণু স্বয়ং। বার্লিনের পদার্থ-বিজ্ঞানীরা নয়, হাইডেলবার্গ প্রভৃতি দূর প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বহু জার্মান অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বার্লিনের

প্রখ্যাত অধ্যাপক ভারবুর্গ এই সময় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে একজন গবেষণাকারীকে বলেছিলেনঃ 'ডক্টর বসু যা করেছেন, তারপর তোমাদের আর বিশেষ কিছু করবার থাকল না।'

১৮৯৭, এপ্রিল মাস। জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর জয়মাল্য মাথায় নিয়ে। দেশে ফিরে তিনি কোন রকম বিশ্রামের কথা চিন্তা না করেই কলেজের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গবেষণাও চালিয়ে যেতে থাকেন। এই শতাব্দীর সূচনায়, ১৯০০ সালে প্যারিসের মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে বিজ্ঞানীদের যে মহাসভা বসে, ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে সে মহাসভায় যোগ দেওয়ার সুযোগ দেন। এটাই ছিল তাঁর দ্বিতীয় বারের অভিযান। এই আন্তর্জাতিক মহাসভায় তিনি 'জীব ও জড় পদার্থের উপর বিদ্যুৎরশ্মি-পাতের ফলের ক্ষমতা' সম্বন্ধে একটা চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই ছিল তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা।

তাঁর এই গবেষণার মূল কথা সংক্ষেপে এইভাবে বলা যেতে পারে। আমরা জানি, জড়ই শক্তির লীলাভূমি আর এই জড়কে আশ্রয় করেই শক্তির প্রকাশ হয়ে থাকে। জড়ের উপর শক্তির কার্যের পরিধি অসীম হলেও, প্রত্যেক কার্যের মূলে পৌঁছলে দেখা যায়, পদার্থের অণুগুলির বিন্যাস বিকৃত ও চঞ্চল করাই শক্তির একটা বড় কাজ। জড় ও শক্তির এই বিশেষ সম্বন্ধটা অবলম্বন করে জগদীশচন্দ্র জীবনক্রিয়ার রহস্য (Mysteries of life) সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি গাছপালার নানা রকমের অঙ্গসঞ্চালন পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, গাছপালা বাইরে থেকে যে তাপ ও আলো পায়, সেই তাপ ও আলোরূপী শক্তিই তাদের দেহের অণুসহা বদলে দিতে থাকে—অণুগুলোকে বিকৃত করে তাদের দেহকে বেঁকিয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে গাছপালার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অণুগুলো একই শক্তি প্রয়োগে একইভাবে উত্তেজিত হয় না এবং এই ব্যাপারটার উপরই গাছপালার নড়াচড়া নির্ভর করে।

তাঁর আগে পণ্ডিতেরা মনে করতেন, গাছপালার নড়াচড়া নির্ভর করে জীবনী শক্তির উপর; সে জীবনীশক্তি যে কি জিনিস তা তাঁরা বলতে পারতেন না। জগদীশচন্দ্র বহু প্রকার পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন, যেহেতু জড় ও জীব সকল পদার্থই অণুদ্বারা গঠিত এবং যেহেতু শক্তির কর্মই হল অণুসহা বদলে দেওয়া, সেই হেতু জীব ও জড় ভেদে শক্তির কাজের কোন পার্থক্য নেই। তিনি নির্জীব ধাতু ও সজীব প্রাণী এবং উদ্ভিদ দেহে বিষ ও মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করে দেখালেন, সকলেই একই রকম সাড়া দিচ্ছে। জগদীশচন্দ্র আরো দেখালেন, জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়ার মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যায় না।

আগেকার পণ্ডিতরা বলতেন, জড় ও জীবের মধ্যে তফাৎ এই যে, জীবে আছে জীবনশক্তি—জীব মরে। জগদীশচন্দ্র মৃত্যুকে সজীবতার লক্ষণ বলে স্বীকার করলেন না। তিনি দেখালেন, ধাতুপিণ্ডও বেশি মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করলে তার মৃত্যু ঘটে। কারণ মৃত্যু তো হচ্ছে দেহাণুগুলোর বাইরের উত্তেজনায় একেবারে চিরতরে নিঃসাড় হয়ে পড়া। সেগুলো শক্তি প্রয়োগে যতক্ষণ তাদের পূর্বাবস্থা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারে ততক্ষণই দেহকে সজীব বলা যায়। বাইরে শক্তি জীবের উপর যে কাজ করে, জীবের একটা ভিতরের শক্তি তার বিপরীতটা করবার চেষ্টা করে,—ব্যাপার দেখে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন ভিতরের শক্তি আর বাইরের শক্তি দুটি পৃথক শক্তি; তাঁরা ঐ ভিতরের শক্তিকেই জীবনীশক্তি বলে নির্দেশ করার চেষ্টা করতেন। ভারতের এই নবীন বিজ্ঞানী দেখালেন, ঐ দুই শক্তি মূলতঃ এক।

১৯০৩ সালের শেষ ভাগে জগদীশচন্দ্র জীব ও উদ্ভিদের স্নায়ুর সাড়া সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ রচনা করে রয়াল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশের জন্য পাঠালেন। কিন্তু সেগুলি তখনই প্রকাশিত হল না। তিন বছর ধরে তিনি বহু পরীক্ষা চালালেন; সে সব পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখে ফেললেন। ১৯০৬ সালে বেরুল 'উদ্ভিদের সাড়া' ('Response of the Non living') এবং

১৯০৭ সালে 'তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত'। ইতিপূর্বে (১৯০২) তাঁর আর একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপের বিজ্ঞানী মহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বইটির নাম—'জীব ও জড়ের সাড়া'। এই প্রথম গ্রন্থের জের টেনেই জগদীশচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে প্রমাণ করলেন যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বাইরের আঘাতে শরীরের আকুঞ্চন প্রসারণাদির দ্বারা যে সাড়া দেয় তার মধ্যে চমৎকার মিল দেখা যায়।

১৯০৭। ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে তাঁর তৃতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযানে পাঠালেন, তাঁর পরীক্ষাপ্রণালীগুলি নিজে গিয়ে দেখাবার জন্য। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে তিনি তাঁর পরীক্ষাগুলো দেখিয়ে এলেন। তাঁর এই সময়কার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাগুলোর সমাদরও হল। দেশে ফিরে এসে তিনি উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও উন্নয়নও চলতে থাকে। ১৯১৪ সালে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে তাঁর চতুর্থ বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রায় পাঠালেন। এইবারের অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির সাহায্যে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে সর্বত্র উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। লণ্ডন রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে তিনি নির্বাচিত হন। আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই এই দুর্লভ সম্মান—F. R. S.—লাভ করেন।

এইভাবে জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান দূরীভূত করে এই ভারতীয় মনীষী বিজ্ঞানের ভাষায় বহুত্বের ভিতর একত্ব প্রমাণ করে বিজ্ঞানের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিলেন সেদিন। এইবার জগদীশচন্দ্র তাঁর সমস্ত কর্মজীবনের লক্ষ্যটিতে পৌঁছলেন। ১৯১৫ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে, আর একবার নানা দেশ ঘুরে তাঁর আবিষ্কারগুলোর কথা প্রচার করে এলেন। ১৯১৭ সালের নববর্ষে ভারত সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত

করলেন। এর আগে ১৯০৩ ও ১৯১২ সালে তাঁকে যথাক্রমে C. I. E. ও C. S. I. উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং য়ুরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত D.Sc. উপাধিতে ভূষিত করে এই বিজ্ঞানীর প্রতিভাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দান করেছিল।

১৯১৭, ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জীবনে এক স্মরণীয় তারিখ। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাসেও এটি একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। এই তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' (Bose Institute)। তেইশ বছর আগে যে সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন এতদিন বাদে আজ তা বাস্তবে রূপায়িত হল। চাকরি জীবনে তিনি যা কিছু সঞ্চয় করেছিলেন, সে-টাকা এবং এক বিশিষ্ট বন্ধুর উইলের বলে প্রাপ্ত টাকা হাতে এসে গিয়েছিল। এছাড়া দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এক লক্ষ টাকা এজন্য জগদীশচন্দ্রের হাতে প্রদান করেছিলেন। এই গবেষণাগারের গৃহনির্মাণ ও ভিতর-বাইরের অলঙ্করণের পরিকল্পনা সবই তাঁর ছিল। এই বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি বাংলায় যে-ভাষণটি পাঠ করেন সেটিতে এই বিজ্ঞানী-ঋষির জীবনের পূর্ণ রূপটি সহজেই চোখে পড়ে, ধরা পড়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ভারতীয়তা, তাঁর নিষ্কাম কর্মসাধনা।

জগদীশচন্দ্র শেষবার ইউরোপ যান ১৯২৮ সালে। সেখানকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তাঁকে সাদরে নিজেদের মধ্যে স্থান করে দিলেন আর তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝে তাঁকে জানালেন শ্রদ্ধা। রোমাঁ রোলাঁ ও বার্ণার্ড শ তাঁকে তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থাবলী উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন। ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর এই যুগন্ধর বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান জগতের এই অক্লান্ত যোদ্ধা লোকান্তর গমন করেন। নবভারতে সর্বসাধনার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার দান কোনদিনই লুপ্ত হবার নয়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১৮৬১-১৯৪৪)

নব্যভারতের নাগার্জুন প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দু রসায়নের লুপ্ত অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার করে এবং পারদঘটিত তেরটি নতুন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার দ্বারা বিশ্বের বিজ্ঞান দরবারে ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার গবেষণা ও পরীক্ষাগারের গণ্ডী অতিক্রম করে, বাংলা তথা ভারতের বৃহত্তর সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক জীবনকেও তিনি স্পর্শ করেছিলেন।

১৮৬১, ২ আগস্ট যশোরের রাড়ুলি গ্রামের এক সংগতি সম্পন্ন শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মের বছরটি রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হয়েছে। ঐ বছরেই ক্রুক্স 'থ্যালিয়াম' আবিষ্কার করেন। পিতা হরিশ্চন্দ্র ও মাতা ভুবনমোহিনীর তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। ভাই-বোন মিলে তাঁরা পাঁচজন—চার ভাই ও এক বোন। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের পটভূমিকায় আছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার জীবনধারার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন। তাঁর জীবনে প্রথম থেকেই এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর ছাত্রজীবনের আরম্ভ। তারপর মাইনর স্কুলে ; এই স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন হরিশ্চন্দ্র। নয় বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্র তাঁর এই পুত্রটিকে নিয়ে কলকাতায় এলেন ও হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেই যে তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়েছিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জ্ঞানানুশীলনে ছেদ পড়েনি। এমন অধ্যয়নশীল তপসী সেদিন বাংলায় বিরল ছিল।

হেয়ার স্কুল তখন কলকাতার একটি বিখ্যাত স্কুল। প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু এখানে বেশি দিন পড়তে পারেন নি। গুরুতর রক্ত আমাশয় অসুখ হওয়ার দরুণ তাঁর স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তিনি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। তখন থেকে দু'বছর পড়াশুনা বন্ধ ছিল, কিন্তু ঐ সময়টা তিনি বৃথা যেতে দেননি—বাড়ির লাইব্রেরীতে ছিল কত বিষয়ের বই ; তিনি সেইগুলি পাঠ করতেন। দু'বছর পরে নিরাময় হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র আবার কলকাতায় এলেন ও অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে তিনিই শিক্ষকদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর মেধা ও অধ্যয়নশীলতার জন্য।

যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হলেন। তখন এফ. এ. ক্লাসের পাঠক্রমের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র অবশ্য পাঠ্য ছিল। মেট্রোপলিটানে রসায়ন পড়াবার ব্যবস্থা তখন ছিল না। কাজেই প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাইরের ছাত্র হিসাবে রসায়নের ক্লাস করতে হত। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ; 'প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম।' এই আকর্ষণের ফলে, এফ. এ. পাশ করার পর তিনি বি. এ. তে তিনি 'বি' কোর্স নিলেন। যথা সময়ে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 'গিল ক্রাইস্ট'* বৃত্তি লাভ করেন ; বৃত্তির টাকায় উচ্চশিক্ষার্থে তিনি বিলাত গমন করেন। ১৮৮২ সালে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়ে প্রাথমিক বি. এস. সি. পরীক্ষার জন্য রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

১৮৮৬। প্রফুল্লচন্দ্র বি. এস. সি. পাশ করে, গবেষণা আরম্ভ

* এটি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বৃত্তি ; প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা লভ্য। প্রফুল্লচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রথম গিলক্রাইস্ট স্কলার।

করেন ও 'ডক্টরেট' (D. Sc.) উপাধির জন্য প্রস্তুত হলেন। এজন্য তাঁকে এইসময় প্রচুর পরিশ্রম করতে হত। ১৮৮৭ সালে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' হয়ে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করলেন। তিনি অজৈব রসায়নে (Inorganic Chemistry) ঐ উপাধি লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি জৈব রসায়ন শাস্ত্র (Organic Chemistry) সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পড়তে থাকেন। তখন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী চর্চা আরম্ভ হয়েছে।

১৮৮৮। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ১৮৮৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের একজন সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার অবসরে তিনি গবেষণার কাজ করতে লাগলেন। তাঁর প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল ঘি আর সরিষার তৈল। তিন বৎসর পর্যন্ত এই কার্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন; গবেষণার ফলাফল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে (১৮৯৪) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালটি প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। পৃথিবীর রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসেও ইহা একটি স্মরণীয় বৎসর। তাঁর গবেষণার ফলে এই বৎসর মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কৃত হয়। রাসায়নিক জগতে সেদিন একজন অজ্ঞাতনামা এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর এই একটি আবিক্রিয়া তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগের ল্যাবোরেটরিটি নতুন ভাবে তৈরি হয় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবোরেটরির ধাঁচে এবং এই কাজে প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা ছিল প্রধান। এই সময় থেকেই রাসায়নিক গবেষণাকার্যে তিনি নতুন শক্তি ও উৎসাহ বোধ করতে থাকেন। এরই পরিণতি ছিল মার্কিউরাস নাইট্রাইট। তাঁর সেই চমকপ্রদ আবিক্রিয়ার কাহিনী রাসায়নিক স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

'মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার দ্বারা আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইল। একদিন পারদের উপর অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা মার্কিউরাস নাইট্রাইট প্রস্তুত করিতে গিয়া আমি নীচে একবার পীতবর্ণের দানা পড়িতে দেখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মিত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কোন basic salt বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ শ্রেণীর 'সল্ট'-এর উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। যাহা হউক, প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা মার্কিউরাস সল্ট এবং নাইট্রাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল।'

অতঃপর তিনি এই নতুন মিশ্র পদার্থ নিয়ে রীতিমত গবেষণা করতে থাকেন। কথিত আছে, এইকালে তিনি অনেক সময় আহার নিদ্রার কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেন; বিজ্ঞানের নবতত্ত্বের অন্বেষণে তাঁর সাধনার বিরাম ছিল না—ক্ষীণ স্বাস্থ্য সত্ত্বেও এই কাজে তাঁর একাগ্রনিষ্ঠা ও পরিশ্রম কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবকেও বিস্মিত করেছিল। তরলীকৃত নাইট্রিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে পারদের গায়ে হরিদ্রাভ বর্ণের সঞ্চার অনেকেই ইতিপূর্বে লক্ষ্য করে থাকলেও এর অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো একটি প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। নয়নলোভন সেই হরিদ্রাভ বর্ণ তাঁর কাছে একটি সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ সৃষ্টির আভাস দিল। শীতল অবস্থায় ঐ অ্যাসিড প্রয়োগে পারদ থেকে তিনি হরিদ্রাবর্ণ মার্কিউরাস নাইট্রাইট (Mercurous Nitrite) প্রস্তুত করলেন। পাশ্চাত্ত্যের প্রথিতযশা রাসায়নিক মণ্ডলী একবাক্যে বাঙালী রাসায়নিকের এই গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এতদিন পরে পারদজাত যৌগিক পদার্থ নিচয়ের একটি শূন্যস্থান পূর্ণ হলো।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্রফুল্লচন্দ্রের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের বিষয় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে যখন (১৮৯৬) প্রকাশিত হয়। তখন সমগ্র ইউরোপের বিজ্ঞানী সমাজে একটি আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। রস্কো, ডাইভার্স,

বার্থেলো, ভিক্টর মেয়ার প্রমুখ ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের বিখ্যাত রাসায়নিকগণ একবাক্যে রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্রের প্রশংসা করলেন। তাঁদের প্রশংসার মূল কথা ছিল ঃ 'By his discovery of the method of preparation of this compound—Mercurous Nitrite—Dr. P. C. Ray has filled up a blank in our knowledge.' এ বড়ো কম প্রশংসার কথা ছিল না। শতাব্দীর শেষ পাদে এসে ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পর্কে ইউরোপের এই যে স্বীকৃতি—এরই ফলে সেদিন বিশ্বের বিদগ্ধ সভায় ভারত আচার্যের বেদীতে বসতে পেরেছিল। 'Master of Nitrites'—এই উজ্জ্বল পরিচয় প্রফুল্লচন্দ্রের ললাটে সেদিন লেখা হয়েছিল। অতঃপর তিনি একটির পর একটি নতুন নতুন মিশ্র পদার্থ আবিষ্কার করতে থাকেন। এইভাবে তিনি পারদঘটিত মোট তেরটি নতুন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার দ্বারা রাসায়নিক আবিষ্কারের ইতিহাসে যেমন একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছিলেন। তেমনি ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই কৃতিত্বের কথা স্মরণ করেই তো এক বাঙালি কবি লিখেছেন ঃ

নব নালান্দা তব চারিপাশে আবার লভেছে স্ফূর্তি,
তোমার মাঝারে নাগার্জুনের ব্রত ধরিয়াছে মূর্তি।

যে সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন সেই সময়ে তিনি নিঃশব্দে আর একটি মহৎ কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। তা হল হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা এবং প্রসিদ্ধ রসায়নাচার্যদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা। এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর মনে অতি অল্প বয়সেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ জন্মেছিল। তাঁর সেই আগ্রহেরই পরিণতি ছিল 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্র' (A History of Hindu Chemistry)। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসেও এটি একটি অবিস্মরণীয়

'মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার দ্বারা আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইল। একদিন পারদের উপর অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা মার্কিউরাস নাইট্রাইট প্রস্তুত করিতে গিয়া আমি নীচে একবার পীতবর্ণের দানা পড়িতে দেখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মিত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কোন basic salt বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ শ্রেণীর 'সল্ট'-এর উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। যাহা হউক, প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা মার্কিউরাস সল্ট এবং নাইট্রাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল।'

অতঃপর তিনি এই নতুন মিশ্র পদার্থ নিয়ে রীতিমত গবেষণা করতে থাকেন। কথিত আছে, এইকালে তিনি অনেক সময় আহার নিদ্রার কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেন; বিজ্ঞানের নবতত্ত্বের অন্বেষণে তাঁর সাধনার বিরাম ছিল না—ক্ষীণ স্বাস্থ্য সত্ত্বেও এই কাজে তাঁর একাগ্রনিষ্ঠা ও পরিশ্রম কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবকেও বিস্মিত করেছিল। তরলীকৃত নাইট্রিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে পারদের গায়ে হরিদ্রাভ বর্ণের সঞ্চার অনেকেই ইতিপূর্বে লক্ষ্য করে থাকলেও এর অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো একটি প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। নয়নলোভন সেই হরিদ্রাভ বর্ণ তাঁর কাছে একটি সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ সৃষ্টির আভাস দিল। শীতল অবস্থায় ঐ অ্যাসিড প্রয়োগে পারদ থেকে তিনি হরিদ্রাবর্ণ মার্কিউরাস নাইট্রাইট (Mercurous Nitrite) প্রস্তুত করলেন। পাশ্চাত্ত্যের প্রথিতযশা রাসায়নিক মণ্ডলী একবাক্যে বাঙালী রাসায়নিকের এই গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এতদিন পরে পারদজাত যৌগিক পদার্থ নিচয়ের একটি শূন্যস্থান পূর্ণ হলো।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্রফুল্লচন্দ্রের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের বিষয় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে যখন (১৮৯৬) প্রকাশিত হয়। তখন সমগ্র ইউরোপের বিজ্ঞানী সমাজে একটি আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। রস্কো, ডাইভার্স,

বার্থেলো, ভিক্টর মেয়ার প্রমুখ ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের বিখ্যাত রাসায়নিকগণ একবাক্যে রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্রের প্রশংসা করলেন। তাঁদের প্রশংসার মূল কথা ছিল : 'By his discovery of the method of preparation of this compound—Mercurous Nitrite—Dr. P. C. Ray has filled up a blank in our knowledge.' এ বড়ো কম প্রশংসার কথা ছিল না। শতাব্দীর শেষ পাদে এসে ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পর্কে ইউরোপের এই যে স্বীকৃতি—এরই ফলে সেদিন বিশ্বের বিদগ্ধ সভায় ভারত আচার্যের বেদীতে বসতে পেরেছিল। 'Master of Nitrites'—এই উজ্জ্বল পরিচয় প্রফুল্লচন্দ্রের ললাটে সেদিন লেখা হয়েছিল। অতঃপর তিনি একটির পর একটি নতুন নতুন মিশ্র পদার্থ আবিষ্কার করতে থাকেন। এইভাবে তিনি পারদঘটিত মোট তেরটি নতুন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার দ্বারা রাসায়নিক আবিষ্কারের ইতিহাসে যেমন একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছিলেন। তেমনি ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই কৃতিত্বের কথা স্মরণ করেই তো এক বাঙালি কবি লিখেছেন :

নব নালান্দা তব চারিপাশে আবার লভেছে স্ফূর্তি,
তোমার মাঝারে নাগার্জুনের ব্রত ধরিয়াছে মূর্তি।

যে সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন সেই সময়ে তিনি নিঃশব্দে আর একটি মহৎ কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। তা হল হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা এবং প্রসিদ্ধ রসায়নাচার্যদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা। এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর মনে অতি অল্প বয়সেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ জন্মেছিল। তাঁর সেই আগ্রহেরই পরিণতি ছিল 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্র' (A History of Hindu Chemistry)। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসেও এটি একটি অবিস্মরণীয়

গ্রন্থ—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ। এই গ্রন্থটি রচনাদ্বারা তিনি একদিকে যেমন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ছিল এই কাজ। হস্তলিখিত কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে তিনি বহু আয়াসে উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে একাদিক্রমে বারো বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

১৯০২ সালে গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৮ সালে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর স্যার আলেকজেণ্ডার পেডলার দুষ্প্রাপ্য পুঁথি পত্রের সংগ্রহের ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্রকে সরকারী ভাবে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। তিনি আচার্যদেবের গুণমুগ্ধদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার পিছনে ছিল একটি চমৎকার ইতিহাস; সেটিও এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। ১৮৯৭ সালে রসায়ন বিজ্ঞানের তদানীন্তন আচার্য ও সংশ্লেষিক রসায়নের (Synthetical Chemistry) শ্রেষ্ঠ ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে বার্থেলো (১৮২৭-১৯০৭) একটি পত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে একবার জানতে চেয়েছিলেন—রসায়ন-শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুদের দান কতটুকু? সেই প্রশ্ন তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল 'হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনায়। সেই সঙ্গে বার্থেলোর সুপ্রসিদ্ধ বই History of Chemistry of the Middle Ages (এই বইটিতেই ইউরোপের রসায়ন চর্চার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে) প্রফুল্লচন্দ্রকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিল। বার্থেলো স্বয়ং এই তরুণ ভারতীয় রাসায়নিককে তাঁর গ্রন্থের তিন খণ্ড উপহার দিয়েছিল।

'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' প্রকাশিত হওয়া মাত্র ভারতে ও বিদেশে সর্বত্র অশেষ সমাদর লাভ করেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এর প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা

বের হয়েছিল—ভারতের প্রত্যেকটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল এই গ্রন্থটিকে উপলক্ষ্য করে। বার্থেলো স্বয়ং এই বইটি সম্পর্কে একটি ফরাসী পত্রিকায় সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন। 'বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বই একটি মহৎ দান'—এই কথা লিখেছিলেন স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ইংলণ্ডে তাঁর বইটি সবচেয়ে বেশি বিক্রী হয়েছিল। মোট কথা, 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' একখানি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, প্রামাণিক গ্রন্থ। আধুনিক ভারতে রসায়ন চর্চার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রই পথিকৃৎ। কেবলমাত্র এই গ্রন্থ রচনা করেই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারবেন।

রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি মহতী কর্মকীর্তির কথা এইবার আমরা একটু আলোচনা করব। বিলাতে অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইউরোপে শিল্প ও বিজ্ঞান চলেছে পাশাপাশি। একে অপরকে সাহায্য করছে। আগে শিল্পের উদ্ভব হয়েছে, তারপরে এসেছে বিজ্ঞান। অবশ্য বিজ্ঞান শিল্পোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্যরূপে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা দেখতে যেতেন ; ঔষধ তৈরির কয়েকটি কারখানা দেখবার সুযোগও তাঁর হয়েছিল। তখন থেকেই যুবক প্রফুল্লচন্দ্রের মনে স্বদেশে একটি রাসায়নিক তথা ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা গড়ে তুলবার ইচ্ছা জেগেছিল। তাঁর সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৮৯৪ সালে যখন তিনি স্থাপন করেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল' নামক একটি শিল্প সংস্থা। এটি তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল।

নবজাত প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলবার জন্য যদিও তিনি ডাক্তার অমূল্যচরণ সেন প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেছিলেন, তথাপি বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দিনরাত যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হতো। 'আমি যখন বেঙ্গল কেমিক্যাল আরম্ভ

গ্রন্থ—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ। এই গ্রন্থটি রচনাদ্বারা তিনি একদিকে যেমন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ছিল এই কাজ। হস্তলিখিত কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে তিনি বহু আয়াসে উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে একাদিক্রমে বারো বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

১৯০২ সালে গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৮ সালে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর স্যার আলেকজেণ্ডার পেডলার দুষ্প্রাপ্য পুঁথি পত্রের সংগ্রহের ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্রকে সরকারী ভাবে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। তিনি আচার্যদেবের গুণমুগ্ধদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার পিছনে ছিল একটি চমৎকার ইতিহাস; সেটিও এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। ১৮৯৭ সালে রসায়ন বিজ্ঞানের তদানীন্তন আচার্য ও সংশ্লেষিক রসায়নের (Synthetical Chemistry) শ্রেষ্ঠ ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে বার্থেলো (১৮২৭-১৯০৭) একটি পত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে একবার জানতে চেয়েছিলেন—রসায়ন-শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুদের দান কতটুকু? সেই প্রশ্ন তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল 'হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনায়। সেই সঙ্গে বার্থেলোর সুপ্রসিদ্ধ বই History of Chemistry of the Middle Ages (এই বইটিতেই ইউরোপের রসায়ন চর্চার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে) প্রফুল্লচন্দ্রকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিল। বার্থেলো স্বয়ং এই তরুণ ভারতীয় রাসায়নিককে তাঁর গ্রন্থের তিন খণ্ড উপহার দিয়েছিল।

'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' প্রকাশিত হওয়া মাত্র ভারতে ও বিদেশে সর্বত্র অশেষ সমাদর লাভ করেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এর প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা

বের হয়েছিল—ভারতের প্রত্যেকটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল এই গ্রন্থটিকে উপলক্ষ্য করে। বার্থেলো স্বয়ং এই বইটি সম্পর্কে একটি ফরাসী পত্রিকায় সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন। 'বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বই একটি মহৎ দান'—এই কথা লিখেছিলেন স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ইংলণ্ডে তাঁর বইটি সবচেয়ে বেশি বিক্রী হয়েছিল। মোট কথা, 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' একখানি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, প্রামাণিক গ্রন্থ। আধুনিক ভারতে রসায়ন চর্চার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রই পথিকৃৎ। কেবলমাত্র এই গ্রন্থ রচনা করেই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারবেন।

রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি মহতী কর্মকীর্তির কথা এইবার আমরা একটু আলোচনা করব। বিলাতে অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইউরোপে শিল্প ও বিজ্ঞান চলেছে পাশাপাশি। একে অপরকে সাহায্য করছে। আগে শিল্পের উদ্ভব হয়েছে, তারপরে এসেছে বিজ্ঞান। অবশ্য বিজ্ঞান শিল্পোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্যরূপে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা দেখতে যেতেন; ঔষধ তৈরির কয়েকটি কারখানা দেখবার সুযোগও তাঁর হয়েছিল। তখন থেকেই যুবক প্রফুল্লচন্দ্রের মনে স্বদেশে একটি রাসায়নিক তথা ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা গড়ে তুলবার ইচ্ছা জেগেছিল। তাঁর সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৮৯৪ সালে যখন তিনি স্থাপন করেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল' নামক একটি শিল্প সংস্থা। এটি তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল।

নবজাত প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলবার জন্য যদিও তিনি ডাক্তার অমূল্যচরণ সেন প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেছিলেন, তথাপি বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দিনরাত যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হতো। 'আমি যখন বেঙ্গল কেমিক্যাল আরম্ভ

করি, তখন কুলীর মতো খেটেছিলাম।'—এ তাঁর নিজেরই কথা। কলেজ থেকে প্রত্যহ বিকাল বেলায় তিনি সোজা চলে আসতেন ফার্মেসীর ল্যাবোরেটরিতে। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠানটি একটি লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয় এবং ১৯০৫ সালে মাণিকতলার একটি প্রশস্ত স্থানে এর নতুন ফ্যাক্টরি ভবন স্থাপিত হয়। রাসায়নিক ও ভেষজ উভয় প্রকার জিনিসই তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। বেঙ্গল কেমিক্যালের উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঔষধ যাতে উন্নত মানের হয় সেই দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তথাপি বাজারে সেইসব ঔষধ চালাতে গিয়ে তাঁকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশীয় গাছ-গাছরা থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি কয়েকটি ঔষধ, যথা, কালমেঘ, কুর্চি, বসেক সিরাপ, যোয়ানের আরক, অশ্বগন্ধা ইত্যাদি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। নব-প্রবর্তিত দেশীয় ভেষজ সেদিন নিজের গুণেই সর্বত্র প্রচারিত হয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের সুনাম ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এইভাবে প্রফুল্লচন্দ্র দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পুনরুজ্জীবিত করে তিনি ভেষজ শিল্পে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। স্থাপিত হওয়ার পর দুই দশক কালের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যালের বিস্ময়কর প্রসার ঘটতে থাকে এবং নানাবিধ কেমিক্যাল (যেমন সালফিউরিক এসিড), ঔষধ, প্রসাধন দ্রব্য, সার্জিকাল যন্ত্র-পাতি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—সবই এখানে প্রস্তুত হয়ে ভারতবর্ষের শিল্প জগতে সত্যিই এক অকল্পিত যুগান্তর এনে দিয়েছিল।

বেঙ্গল কেমিক্যাল একদিকে যেমন রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা ও পরিশ্রমের চিরস্থায়ী স্মৃতিমন্দির, অন্যদিকে এ তেমনি বাঙালির সংহত প্রয়াসের একটি উন্নত কীর্তিস্তম্ভ। বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতিতে এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যিনি সারা জীবন ধরে তাঁর স্বদেশবাসীর অন্ন সমস্যার কথা চিন্তা করেছিলেন, যিনি বাঙালির মস্তিষ্কের অপব্যবহার দেখে

দেশের যুব সম্প্রদায়কে ধিক্কার দিতেন, মানুষটি ভারতবর্ষে রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ তৈরির যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন তার মূল্যায়ন কবেই হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের সহায়তায় এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের পথ তিনিই তো প্রশস্ত করে গিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। অধ্যাপনা, ইতিহাস প্রণয়ন ও বেঙ্গল কেমিক্যাল—প্রধানত এই তিনটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুণ তিনি আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছিলেন। তাই এখন তিনি ইউরোপের নব্য রসায়ন বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইউরোপে এলেন ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে। 'Dr. P. C. Roy' —এই নামটি তখন ইউরোপের বিজ্ঞানী সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইবার তিনি ডেভি-ফ্যারাডে ল্যাবোরেটরি এবং লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ ল্যাবোরেটরিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে তিনি লিডস্, ম্যানচেষ্টার এবং বার্মিংহামের প্রসিদ্ধ ল্যাবোরেটরিগুলি পরিদর্শন করেন ও সমকালীন বহু খ্যাতনামা রাসায়নিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বার্লিনে এসে অজৈব রসায়নের বিখ্যাত অধ্যাপক এর্ডম্যানের ল্যাবোরেটরিটিও দেখলেন। বিখ্যাত ডাচ্ রাসায়নিক ভ্যাণ্ট হফের ল্যাবোরেটরিতেও কিছুকাল তিনি হাতে-কলমে কাজ করেছিলেন। নব্য রসায়নে ইউরোপের মধ্যে তখন প্যারিসের স্থান ছিল শীর্ষস্থানীয়। প্রফুল্লচন্দ্র এখানে যখন আসেন তখন বৃদ্ধ বার্থেলো এই তরুণ ভারতীয় রাসায়নিককে পরম সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

এইভাবে প্রায় সাত-আটমাস কাল প্রফুল্লচন্দ্র ইউরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তন্ন তন্ন করে দেখে বেড়িয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি ল্যাবোরেটরিগুলি যত্নের সঙ্গে পরিদর্শন করতেন। ইউরোপের যে যে দেশে তিনি গিয়েছিলেন, সেখানেই বিজ্ঞানীগণ প্রফুল্লচন্দ্রকে Savant বলে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের হয়ে এই

যে তিনি ইউরোপের কাছ থেকে সম্মান আদায় করেছিলেন, সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। এর পর তিনি তৃতীয়বার বিলাত গিয়েছিলেন ১৯১২ সালে। ঐ বছর লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট তাঁকে এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক কংগ্রেসে প্রফুল্লচন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন সেটি ওদেশের রসায়ন জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র যেন বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁরই দানে সৃষ্ট 'নাগার্জুন পুরস্কার' আজও এই রাসায়নিকের স্মৃতি বহন করে চলেছে। রসায়নে তিনি যে এক নবীন গোষ্ঠি তৈরি করেছিলেন উত্তরকালে তাঁদের প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। শিক্ষক হিসাবে এটাই ছিল তাঁর বড় কৃতিত্ব। তাঁর জীবনে দেশ-বিদেশের সরকারী ও বেসরকারী বহু সম্মান লাভ ঘটেছিল—কিন্তু যশ বা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি চিরকাল নিস্পৃহ ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি যেন ম্যাডাম কুরী বা আইন-স্টাইনের সগোত্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি মহতী কীর্তি—তিনিই ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। ১৯৪৩ সালে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পালিত অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন বিজ্ঞান কলেজের গৃহেই প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। নবীন ভারতের সর্বসাধনার মধ্যে তিনি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

———

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

(১৮৮৮-১৯৭০)

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর মন্দিরে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে প্রবেশ করেছিলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। আঠারো বছর বয়স থেকে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, তিনি বিজ্ঞানের জন্য জীবিত ছিলেন; বিজ্ঞানই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তিনি নিজেই বলেছেন: 'বিজ্ঞান ছাড়া আমার জীবনের অস্তিত্ব নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে আমি যে রকম আনন্দ পেয়ে থাকি ঠিক সেই রকম আনন্দ আমি অন্য কিছুর মধ্যে পাই না।' পদার্থবিদ্যায় তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে রামনকে দিয়েছে এক অনন্যলব্ধ প্রতিষ্ঠা। আধুনিক ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই দুর্লভ নোবেল পুরস্কার লাভ করে তাঁর জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

১৮৮৮, ৭ নভেম্বর, দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপলিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে চন্দ্রশেখর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতামাতার প্রথম সন্তান ছিলেন। পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার আর মা পার্বতী আম্মল দুজনেই এমন একটি পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন যে বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। তাঁদের এই বাসনা অপূর্ণ থাকেনি। তাঁরা এমন একটি পুত্র রত্ন লাভ করেছিলেন যিনি শুধু তাঁদের বংশের নয়, সমগ্র দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। রামনের জন্মকালে তাঁর পিতা ছাত্রাবস্থায় শিক্ষকতা করতেন এবং তখন তিনি স্নাতক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মাইনে পেতেন মাত্র দশ টাকা। 'আমি রূপার চামচের পরিবর্তে একটি তামার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছিলেন।' তাঁর পিতা

তাঁদের বংশানুক্রমিক কৃষিকার্যের ধারা পরিত্যাগ করে লেখাপড়া শিখতে মনস্থ করেছিলেন। যেমন পরিশ্রমী, তেমনি মেধাবী ছিলেন তিনি। স্নাতক হওয়ার পর তিনি বিশাখাপত্তনম একটি কলেজে গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও চন্দ্রশেখর আয়ারের অনেক গুণ ছিল। তিনি একজন দক্ষ বেহালা ও বীণা বাদক ছিলেন। রামনের মা যে পরিবার থেকে এসেছিলেন সেই পরিবার সংস্কৃতচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে, রামনের মাতামহ দক্ষিণ ভারত থেকে পদব্রজে নবদ্বীপে এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। নবদ্বীপ তখন সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান বলে গণ্য ছিল। এই রকম পিতামাতার সন্তান হওয়ার জন্য রামন নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন। 'সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করিনি বটে, কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে জন্মেছিলাম, আমার ভাবী জীবন গঠনের পক্ষে তা সহায়ক হয়েছিল।'

১৯০২। ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন তিনি। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৪ সালে স্নাতক হলেন এবং ১৯০৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বি. এ. তে পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। মোট কথা, অতিশয় দেদীপ্যমান ছিল রামনের ছাত্রজীবন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে গবেষণা-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাঁর প্রথম গবেষণা পত্রটির নাম ছিল 'Unsymmetrical Diffraction bands due to a Rectangular Aperture,'—এটি ১৯০৬ সালে লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় আর ১৯০৭ সালে বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল গবেষণামূলক আর একটি প্রবন্ধ। কারো কাছ থেকে কোন প্রকার সুপারিশ

ছাড়াই তিনি প্রবন্ধ দুটি পাঠিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী স্যার সি. ভি. রামনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এই ছিল সূচনা অথবা পূর্বাভাষ।

এম. এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্র জীবনের পরি-সমাপ্তি ঘটে এবং সেই বছরেই তিনি বিদুষী ও অশেষ গুণবতী কুমারী লোক-সুন্দরী আম্মলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। লেডি আম্মল সর্বাংশে তাঁর স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী ছিলেন। ইচ্ছা ছিল তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে থাকবেন কিন্তু তাঁর পিতার ইচ্ছানুযায়ী রামনকে সর্বভারতীয় I. A. F. (ইণ্ডিয়ান অডিট ও ফাইনান্স) পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই-মাসের মধ্যে তিনি অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয় দুটি অধ্যয়ন করেন। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ১৯০৭ সালেই তিনি সর্বভারতীয় অডিট সার্ভিসে প্রবিষ্ট হন ও এই বছরেই তিনি কলকাতায় এলেন ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল হয়ে, তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছরও হয়নি। পরবর্তী দশ বছরে কর্মজীবনে তিনি বহু খ্যাতি লাভ করেন। যদি তিনি সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকতেন তাহলে উত্তরকালে শুধু প্রমোশন নয়, সর্বোচ্চ পদটি—অডিটর জেনারেল—তিনি লাভ করতেন; এমনকি, ভারত সরকারের ফাইনান্স সেক্রেটারির পদেও তাঁর নিয়োগ সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিলনা যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অপচয় ঘটে এইভাবে। কলকাতা, রেঙ্গুন,* ও নাগপুরে—তাঁর চাকরিজীবনের দশটি বছর এই তিনটি শহরে অতিবাহিত হয়েছিল।

১৯০৭ সালে রামন যখন ডেপুটি অ্যাকাউন্টাণ্ট জেনারেল হয়ে

---

* আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

এলেন তখন অবসর সময়টা তিনি বিজ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত করতেন। কলকাতায় বিজ্ঞান অনুশীলনের সূচনা হয় ১৮৭৬ সালে। স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অক্লান্তচেষ্টা ও উদ্যোগে এই বছরে ২১০ নম্বর বৌবাজার স্ট্রীটে (এখনকার নাম বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট) স্থাপিত হয় অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স। এইখানে বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, ফাদার লাফোঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন এইটিই ছিল বিজ্ঞান অনুশীলনের একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

কলকাতায় এসে রামন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হন ও অবসরকালে গবেষণা করতে থাকেন। বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম এখানে বিশেষ কিছু ছিল না—যা ছিল তা সামান্যই। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিসের কাজ সেরে তিনি এখানে আসতেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকতেন। তাঁর এই প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণার বিষয় ছিল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের শব্দবিজ্ঞান এবং আলোক বিজ্ঞান। তাঁর গবেষণার কাজে সুবিধা হবে বলে রামন তখন অ্যাসোসিয়েশনের সন্নিকটবর্তী একটি বাড়িতে বাস করতেন। যদিও তাঁর মতো একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে সেটি আদৌ উপযোগী ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও তাঁর জীবনের অধিকাংশ বছরগুলি কেলাস (Crystals) এবং আলোক বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণায় ব্যয়িত হয়েছিল, তথাপি পদার্থবিজ্ঞানের চর্চায় তাঁর প্রথম আকর্ষণ ছিল শব্দবিজ্ঞান (acoustics) এবং এই ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা বড় কম ছিল না। মানুষ কান দিয়ে শব্দ শোনে—এ আমরা জানি, কিন্তু মানুষের কানে শব্দের এই অনুভূতিটা আসছে কি ভাবে? এই সমস্যাটি নিয়ে শেষ জীবনে রামন প্রচুর চিন্তাভাবনা করতেন।

১৯১৭ সালটি বিজ্ঞানী রামনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিজ্ঞান কলেজ (University College of Science and Technology) তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের অর্থানুকূল্যে। ১৮৫৮ সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এতকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার কোন রকম আয়োজন করে উঠতে পারেনি। ১৯১৭ সালে বিজ্ঞান কলেজের কাজ শুরু হয়। তখন এখানে রসায়নের 'পালিত অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত হন আধুনিক ভারতের নাগার্জুন প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম 'পালিত অধ্যাপক' হওয়ার গৌরব লাভ করেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। স্যার আশুতোষের অনুরোধেই তিনি সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়ে বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন।

যে ষোল বছর কাল (১৯১৭-১৯৩৩) তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, রামনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ ও তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়াগুলি এই সময়ের মধ্যেই হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়ান্স প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারে গবেষণারত থাকার সময়েই তিনি বিলাতের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি ওদেশের বিজ্ঞানী সমাজে খুবই সমাদর লাভ করেছিল। ১৯১৭ সালে যখন তিনি পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন, সেই বছরে কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের একটি শাখার (Physico-mathematics) তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি পালিত অধ্যাপকের পদ এই শর্তে গ্রহণ করেছিলেন যে, বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার ল্যাবোরেটরি ও এসোসিয়েশনের ল্যাবোরেটরি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে—তাঁর গবেষণার পক্ষে এর প্রয়োজন ছিল। তারপর ১৯১৭ সালে এসোসিয়েশনের সম্পাদক

এলেন তখন অবসর সময়টা তিনি বিজ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত করতেন। কলকাতায় বিজ্ঞান অনুশীলনের সূচনা হয় ১৮৭৬ সালে। স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অক্লান্তচেষ্টা ও উদ্যোগে এই বছরে ২১০ নম্বর বৌবাজার স্ট্রীটে (এখনকার নাম বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট) স্থাপিত হয় অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স। এইখানে বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, ফাদার লাফোঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন এইটিই ছিল বিজ্ঞান অনুশীলনের একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

কলকাতায় এসে রামন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হন ও অবসরকালে গবেষণা করতে থাকেন। বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম এখানে বিশেষ কিছু ছিল না—যা ছিল তা সামান্যই। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিসের কাজ সেরে তিনি এখানে আসতেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকতেন। তাঁর এই প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণার বিষয় ছিল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের শব্দবিজ্ঞান এবং আলোক বিজ্ঞান। তাঁর গবেষণার কাজে সুবিধা হবে বলে রামন তখন অ্যাসোসিয়েশনের সন্নিকটবর্তী একটি বাড়িতে বাস করতেন। যদিও তাঁর মতো একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে সেটি আদৌ উপযোগী ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও তাঁর জীবনের অধিকাংশ বছরগুলি কেলাস (Crystals) এবং আলোক বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণায় ব্যয়িত হয়েছিল, তথাপি পদার্থবিজ্ঞানের চর্চায় তাঁর প্রথম আকর্ষণ ছিল শব্দবিজ্ঞান (acoustics) এবং এই ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা বড় কম ছিল না। মানুষ কান দিয়ে শব্দ শোনে—এ আমরা জানি, কিন্তু মানুষের কানে শব্দের এই অনুভূতিটা আসছে কি ভাবে? এই সমস্যাটি নিয়ে শেষ জীবনে রামন প্রচুর চিন্তাভাবনা করতেন।

১৯১৭ সালটি বিজ্ঞানী রামনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিজ্ঞান কলেজ (University College of Science and Technology) তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের অর্থানুকূল্যে। ১৮৫৮ সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এতকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার কোন রকম আয়োজন করে উঠতে পারেনি। ১৯১৭ সালে বিজ্ঞান কলেজের কাজ শুরু হয়। তখন এখানে রসায়নের 'পালিত অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত হন আধুনিক ভারতের নাগার্জুন প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম 'পালিত অধ্যাপক' হওয়ার গৌরব লাভ করেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। স্যার আশুতোষের অনুরোধেই তিনি সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়ে বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন।

যে ষোল বছর কাল (১৯১৭-১৯৩৩) তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, রামনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ ও তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়াগুলি এই সময়ের মধ্যেই হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়ান্স প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারে গবেষণারত থাকার সময়েই তিনি বিলাতের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি ওদেশের বিজ্ঞানী সমাজে খুবই সমাদর লাভ করেছিল। ১৯১৭ সালে যখন তিনি পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন, সেই বছরে কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের একটি শাখার (Physico-mathematics) তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি পালিত অধ্যাপকের পদ এই শর্তে গ্রহণ করেছিলেন যে, বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার ল্যাবোরেটরি ও এসোসিয়েশনের ল্যাবোরেটরি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে—তাঁর গবেষণার পক্ষে এর প্রয়োজন ছিল। তারপর ১৯১৭ সালে এসোসিয়েশনের সম্পাদক

ডাক্তার অমৃতলাল সরকারের মৃত্যুতে রামনকে ঐ পদে নির্বাচিত করা হয়। তিনি যতদিন কলকাতায় ছিলেন ততদিন এই দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তখন থেকেই কলকাতায় একদল নবীন গবেষক তাঁর নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে থাকেন এই দুই স্থানে—পদার্থবিদ্যার একটি নতুন school গড়ে উঠেছিল এই সময়ে, যেমন গড়ে উঠেছিল রসায়ন চর্চার জন্য একটি নতুন গোষ্ঠী, রসায়নের পালিত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে। এইভাবে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ও চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের প্রচেষ্টায় সেদিন সমগ্র ভারতে কলকাতা হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র। এসোসিয়েশনে প্রদত্ত রামনের সান্ধ্য বক্তৃতাবলী বিজ্ঞান অনুরাগী শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। ঐসময় কলকাতায় ইউরোপীয়ানদের পরিচালিত একটি দৈনিক পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞান কলেজে ছাত্রদের কাছে তিনি খুব জনপ্রিয় অধ্যাপক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। রামন সাহেব বলে তারা তাঁকে অভিহিত করত। তাঁর শিক্ষকতার গুণে প্রত্যেকটি ছাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেদিন।

১৯২১ সালে বিজ্ঞানী রামনের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরের গ্রীষ্মকালে অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করার জন্য রামন বিলাত গমন করেন। এই তাঁর প্রথম ইউরোপ যাওয়া; অধ্যাপক সি. ভি. রামনের খ্যাতি তখন পুরোগামী—তাঁর একাধিক গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায় তখন প্রকাশিত হয়েছে। ওদেশের বিশিষ্ট পদার্থবিদদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং ভাবের আদান-প্রদান করার একটা সুযোগ পেলেন তিনি। লণ্ডনের ফিজিক্যাল সোসাইটিতে তিনি আলোকবিজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু পদার্থবিজ্ঞানী ঐ বক্তৃতা শুনবার জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা

সকলেই পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই ইউরোপ যাত্রাকালে সমুদ্রপথে প্রকৃতির একটি সৌন্দর্য বিজ্ঞানীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল—সুগভীর নীল সমুদ্রের রঙ। পর্যবেক্ষণের ফলে রামনের মনে হয়েছিল যে এই বিষয়ে প্রচলিত ধারণা আদৌ সম্পূর্ণ নয়। সমুদ্রের নীল রঙ আর আকাশের নীল রঙ—দুটিই মূলত একই বস্তু। তাঁর এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীরা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেছিলেন সেদিন।

ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রামন আলোকের Mollecular Diffraction বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে, কোন অসচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়ে যখন আলো যায় তখন তার রূপান্তর ঘটে। পরে তিনি গ্যাস, তরল পদার্থ ও কঠিন বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন সেগুলি পুস্তিকাকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই গবেষণার ফল ইউরোপের বিজ্ঞানীসমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে ; ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির তিনি 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তখন রামনের বয়স মাত্র ছত্রিশ বছর। ১৯২৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এইবার তিনি আমেরিকা, ইংলণ্ড ও নরওয়ে ভ্রমণ করে সর্বত্র তাঁর আলোক বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

১৯২৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। এই বছরেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। এর পরই তাঁর জীবনে এল সর্বোচ্চ সম্মান।

১৯৩০ সালে তাঁর আবিষ্কৃত 'Raman Effect-'এর জন্য তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে রামন চলে আসেন ব্যাঙ্গালোরে এখানকার সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রথম ডিরেক্টর হয়ে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি রামনকে একটি স্বর্ণ পদক (Hughes Medal) দানে সম্মানিত করেন। এই পদকটি তাঁকে প্রদান করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড।

যে পনর বৎসর কাল (১৯৩৩-৪৮) তিনি ব্যাঙ্গালোরে ইনস্টি-টিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানটির অধিক উন্নতি হয়েছিল এবং রামন নিজেও পদার্থবিজ্ঞানে আরো অনেক বিষয়ের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সেইসব গবেষণাও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই সময় তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে এক নবীন গবেষক গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৪ সালে অধ্যাপক রামন প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর নিজস্ব গবেষণার প্রতিষ্ঠান—ইণ্ডিয়ান আকাদেমি অব সায়ান্স। মৃত্যুকাল অবধি তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। এতকাল ভারতবর্ষ থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। বিলাতের বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকার অনুরূপ একটি পাক্ষিক-পত্রিকা 'কারেন্ট সায়ান্স' এই আকাদেমি থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন তিনি।

১৯৪৯। রামনের জীবনের আর একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বছর তিনি 'রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট" নামে একটি নিজস্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এটিই তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। এবং এটি সর্বতোভাবে ছিল তাঁর একক প্রচেষ্টা। স্বাধীন ভারতে তাঁরই পরামর্শক্রমে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু একাধিক গবেষণাগার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৭০, ২১ নভেম্বর, ব্যাঙ্গালোরে তাঁর নিজস্ব ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে আপন প্রতিভাবলে তিনি দেদীপ্যমান ছিলেন। তাঁর আবিষ্কার 'রামন প্রক্রিয়া' পদার্থবিজ্ঞানে এনে দিয়েছে যুগান্তর।

সত্যেন বোস

(১৮৯৪-১৯৭৪)

যে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীর অনন্যসাধারণ মৌলিক গবেষণায় আকৃষ্ট হয়ে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন স্বয়ং সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন, তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সত্যেন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত আলোক-কণার সংখ্যায়নিক সূত্র আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং স্বয়ং আইনস্টাইন এই সূত্রকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। 'বোস সংখ্যায়ন' (Bose Statistics) নামে অভিহিত এই সূত্রটি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দুটি সুদৃঢ় ভিত্তিস্তম্ভের অন্যতম বলে স্বীকৃত। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে সুবিদিত। কেবলমাত্র বিজ্ঞানী হিসাবেই তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বিজ্ঞানের প্রাঙ্গন অতিক্রম করে সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি সকল অঙ্গনেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি বড় পরিচয় দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা উন্মেষকল্পে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য নিরন্তর প্রয়াস।

বাংলার নবজাগরণের যুগসন্ধিক্ষণে ১৮৯৪, নববর্ষের প্রথম দিনে উত্তর কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে সত্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর মাতাপিতার প্রথম ও একমাত্র সন্তান: তাঁর ছয়টি বোন ছিল। ১৯০৯ সালে হিন্দু স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হলেন। ১৯১৩ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এস-সি পরীক্ষা পাস করার পর তিনি ব্যবহারিক গণিতে এম. এস-সি. পাস করেন। ইন্টারমিডিয়েট, বি. এ. সি. ও এম. এস. সি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে সকলকে বিস্মিত করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণমেধা শিক্ষক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর পাঠ্যাতিরিক্ত বহু বিষয়ে অধ্যয়ন ও অনুশীলনের আগ্রহ ছিল।

সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ যখন ভাবছিলেন 'কি করবেন', এমন সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির কাছ থেকে আহ্বান এল সদ্যস্থাপিত বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের জন্য। ১৯১৬ সালে তিনি এখানে পদার্থবিদ্যার লেকচারার নিযুক্ত হলেন। তাঁর সহপাঠী ও সুহৃদ মেঘনাদ সাহাও ঐ সময়ে বিজ্ঞানকলেজে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন। দুই বন্ধু মিলে এখানে উচ্চতর পদার্থবিদ্যা পঠনপাঠন ও গবেষণায় নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে লেকচারাররূপে একযোগে কাজ করেছিলেন। তারপর তাঁরা দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার ও অধ্যাপক হয়ে চলে যান।

পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। সেই সঙ্গে এই বিভাগটির সংগঠনেও তাঁকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হল। ঢাকায় অধ্যাপনাকালে ১৯২৩-২৪ সালে তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর একটি গবেষণা নিবন্ধ ইংলণ্ডের বিশিষ্ট পত্রিকা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক সেটি প্রকাশে অযথা কালক্ষেপন করেন। এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে আইনস্টাইনের কাছে উক্ত প্রবন্ধের একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন: 'আমার সেই চার পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি*

* এটি ঠিক প্রবন্ধ ছিলনা, ছিল চার পৃষ্ঠাব্যাপী একটি মৌলিক সমীকরণ।

পাওয়া মাত্র আচার্য আইনস্টাইন সেটির সারবত্তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে, নিজে সেটি জার্মান ভাষায় তর্জমা করেছিলেন এবং জার্মানির একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।' শুধু তাই নয়; প্রবন্ধের শেষে তিনি এই মন্তব্যটি যোগ করে দিয়েছিলেন: 'Bose's method of derivation of Planck's,* law, in my opinion, signifies a forward step.' সত্যেন্দ্রনাথ এই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত এই ভারতীয় বিজ্ঞানীকে একটি চিঠি দিয়ে তাঁর অভিমতও জানিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই কাজটি 'বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' বা শুধু 'বোস সংখ্যায়ন' নামে সুবিদিত।

আইনস্টাইনের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার একটি সুফল এই হয়েছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের খরচে সত্যেন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠালেন। ১৯২৪ সালে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। তুবছরের জন্য ছুটি ও অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল। তাঁর গন্তব্য স্থান ছিল জার্মানি—সেখানে তিনি বার্লিনে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পান। বার্লিনের পথে তিনি প্যারিসে বিশ্ব-বিশ্রুতা মাদাম কুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন: 'তাঁর সঙ্গে প্রথম যখন দেখা করতে যাই, ঘরে ঢুকে দেখলাম তাঁর টেবিলের উপর স্তূপীকৃত বই ও কাগজপত্র রয়েছে এবং এক কোণে রয়েছে তাঁর প্রিয় বেহালাখানি।' সাক্ষাতের সময় থেকে তাঁদের তুজনের মধ্যে গুরুশিষ্যের সমতুল যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় তা আইনস্টাইনের মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর একলব্য শিষ্য ছিলেন। গুরুর প্রতি তিনি চিরকাল অপরিসীম

* ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮—১৯৪৭)। জার্মান বিজ্ঞানী; কোয়ান্টাম তত্ত্বের উদ্ভাবক।

শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ দুইটি নাম—বোস আইনস্টাইন-চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

১৯২৭ সালে স্বদেশে ফিরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি বিজ্ঞান বিভাগের ডীন (Deen) নির্বাচিত হলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁর অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ আশাতীত উন্নতি লাভ করে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং নানা বিষয়ে উন্নত ধরনের গবেষণা চলতে থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ অধ্যাপক ও ডীন উভয় কাজের দায়িত্ব যেভাবে সম্পাদন করেছিলেন তাতে ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেন। এইভাবে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে অধাপনা করার পর কলকাতায় চলে আসেন। অধ্যাপনা কালে ১৯২৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি পদে এবং ১৯৪৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনের মূল সভাপতি পদে বৃত হন। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল।

অতঃপর আমরা এই বিজ্ঞানীকে দেখতে পাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপকরূপে। এই পদে তিনি বারো বছর (১৯৪৫—১৯৫৬) সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে তিনি অনেককাল অধ্যক্ষতা করেন। স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডীন পদেও তিনি কয়েক বছর আসীন ছিলেন এবং বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কার্য পরিচালনা করেছিলেন। কলকাতায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে তিনি বাংলা ভাষাতেই পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয় এমন সরল ও সহজভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতেন যে তা ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে কষ্ট হত না। উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যে মাতৃভাষায় সম্ভব—এটা সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দেখালেন।

শিক্ষকরূপে সত্যেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও জটিল বিষয়ের প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন মুগ্ধ করত, তেমনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি কোমল অনুভূতিশীল হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে তারা অভিভূত হত। অন্য দিকে, গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন জ্ঞানরাজ্যের রত্নাকর। জ্ঞানরাজ্যের সকল বিষয়ের সন্ধান মিলত তাঁর কাছে—বিশ্বপ্রকৃতির সকল রহস্য সমাধানে তিনি ছিলেন সহায়ক। বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি সকল বিষয়ের গবেষককে সমানভাবে উপদেশ দিতেন। বস্তুত, কি পদার্থবিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি গণিত, কি উদ্ভিদবিজ্ঞান—সত্যেন্দ্রনাথের মতো বিজ্ঞানের এত বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক ও গভীর পরিচিতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নেওয়ার কিছুকাল পরে তাঁকে আমরা দেখতে পাই বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যতদিন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন ততদিন এর নানা বিভাগে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তাঁরই কার্যকালে বিশ্বভারতীতে সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার সত্যেন্দ্রনাথকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করে সম্মানিত করেন। জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগেই নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন; দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এখানে স্বীয় গবেষণার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। শুধু নিজের গবেষণা নয়, দেশের নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রকল্পে ও বিজ্ঞান প্রগতির নানা কাজে তিনি যোগদান করতেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন দেশ-বিদেশের নানা সম্মাননায় উজ্জ্বল। কিন্তু আইনস্টাইনের মতো তিনি ছিলেন খ্যাতিনিস্পৃহ এবং আপন মহত্ত্বে উদাসীন—নিজে কোনদিন কোন সম্মানের জন্য উন্মুখ হন নি। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট

উপাধি প্রদান করেন। ১৯৫৪ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেন। বিদেশী বৈজ্ঞানিক সংস্থার আমন্ত্রণক্রমে ও ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ বহুবার বিদেশে গমন করেছেন। ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ প্রদানের জন্যও তিনি আমন্ত্রিত হতেন। ১৯৫৮ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' (F. R. S.) নির্বাচিত হন।

সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অবদান হল 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' (Bose-Einstein statistics)। এই তত্ত্ব জটিল গাণিতিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা আপেক্ষিকতত্ত্বের মতো সাধারণের বোধগম্য নয়। সাধারণভাবে তত্ত্বটি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু' একটি কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা জানি, বহু ব্যষ্টিমিলে সমষ্টির সৃষ্টি এবং একের বা ব্যষ্টির যা আচরণ, সমষ্টির আচরণ তা থেকে ভিন্ন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা যখন একক ভাবে অবস্থান করি, তখন আমরা যা কিছু করি তাতে আমাদের ব্যক্তিবিশেষের আচরণই প্রকাশ পায়। কিন্তু কোন মেলায় বা বৃহৎ জন সমাবেশে যখন লোকদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়, তখন তাতে সমষ্টিরই আচরণ প্রকটিত হয়—ব্যষ্টির নয়।

মানুষের ক্ষেত্রে এই যা বলা হল, আমাদের বায়ুমণ্ডলে বিরাজমান অগণিত গ্যাস-অনুর ক্ষেত্রেও সেকথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বায়ু-মণ্ডলে গ্যাস-অনুর যে আচরণ আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষ করি, সেটা তাদের সমষ্টিরই আচরণ। উনবিংশ শতকের গোড়ায় ম্যাক্সওয়েল এবং বোলৎসমান গ্যাসের অণুদের গতি ব্যাখ্যার জন্য সমষ্টিবিধি বা সংখ্যায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁরা বললেন, অসংখ্য গ্যাস-অণুর সমাবেশে প্রতিটি অণুর বিক্ষিপ্ত গতির কথা চিন্তা না করে তাদের সমষ্টিগত গতির কথাই চিন্তা করতে হবে। কারণ অগণিত গ্যাস-অণুর যে আচরণ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সেটা তাদের সমষ্টিরই আচরণ, ব্যষ্টির নয়।

১৯০০ সালে প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী প্লাঙ্ক কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণে বিভিন্ন শক্তির পরিমাপ সম্বন্ধে একটি সূত্র দেন। এই সূত্র তাঁর নামানুসারে প্লাঙ্ক সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্রে প্লাঙ্ক কল্পনা করেন—বিকিরণে শক্তির পরিবর্তন নিরবছিন্নভাবে হয় না—হয় শক্তিগুচ্ছের (quanta) মাধ্যমে। প্লাঙ্কের এই কল্পনা 'কোয়াণ্টামবাদ' বা শক্তিকণাবাদ নামে অভিহিত। নিউটনীয় গতিবিদ্যা ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে পদার্থবিদ্যা ইতিপূর্বে গড়ে উঠেছিল তাতে শক্তির পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়—এই ধারণাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হত। সুতরাং প্লাঙ্কের এই বিপরীত ধারণা অর্থাৎ কোয়াণ্টামবাদ পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটায়।

কিন্তু প্লাঙ্ক যেভাবে তার সূত্র প্রমাণ করেন তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একেবারে ত্রুটিশূন্য বা অনাপত্তিজনক ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৪ সালে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন বোস এক অভিনব ও সুসঙ্গত পদ্ধতিতে প্লাঙ্ক সূত্রের প্রমাণ দিলেন। তাঁর এই প্রমাণকেই আইনস্টাইন 'একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত বিকিরণ সূত্রে আলোক কোয়াণ্টা বা ফোটনকে (Photon) তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের শক্তি কোয়াণ্টা হিসাবেই গণ্য করেছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ আলোক-কোয়াণ্টাকে বস্তুকণার সমতুল্য গণ্য করে অগ্রসর হয়েছিলেন। ফোটনের তরঙ্গ-চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কণা-চরিত্রের ভিত্তিতে তিনি প্লাঙ্ক-সূত্রকে উপস্থাপিত করলেন। প্লাঙ্ক সূত্রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি এটিকে সংখ্যায়নিক সমস্যা হিসাবে সমাধান করলেন। প্রতিটি কোয়াণ্টার স্থিতি ও ভরবেগ যুগপৎ নির্ধারণ করা যেতে পারে—এই ছিল প্রচলিত মত। তিনি গেলেন পৃথক রাস্তায়, ভরহীন আলোক-কোয়াণ্টাকে সাধারণ ভরসম্পন্ন বস্তুকণার মতো প্রয়োগ করলেন তাঁর গবেষণায়। এইভাবেই সত্যেন্দ্রনাথ সরাসরি নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন প্লাঙ্কের

বিকিরণ সূত্র। বোস-সংখ্যায়ণ নিঃসন্দেহে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় সংযোজিত করেছে এক নতুন অধ্যায়।

জীবনের দীর্ঘকাল সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান-সাধনায় অনলস ও একাগ্রভাবে নিমগ্ন ছিলেন। আবার দেখি মানবীয় সকল বিষয়ের প্রতি—সাহিত্য, ইতিহাস, সংগীত ও ললিতকলা—তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ এবং প্রবল কৌতূহল। একজন সুদক্ষ এস্রাজবাদক ছিলেন তিনি। বঙ্গ সংস্কৃতির তিনি একজন নিষ্ঠাবান পূজারী ছিলেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সম্ভাব্যতা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আজীবন তিনি আগ্রহ পোষণ করে এসেছেন। তাঁর আগ্রহ চরিতার্থ হয়নি, কিন্তু বঙ্গীয়-বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি অন্তত একটি দিকে তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে পেরেছেন। ১৯৪৮ সালে এই পরিষদ স্থাপিত হয় তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কালে প্রধানত সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও প্রেরণায় দ্বৈমাসিক বাংলা বিজ্ঞান-পত্রিকা 'বিজ্ঞান পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় সম্ভবত এটিই বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রথম পত্রিকা ছিল।

বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত হওয়ার পর এর মুখপত্র হিসাবে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁর পৈতৃক বাসভবনের সন্নিকটে নির্মিত পরিষদের নিজস্ব গৃহ এই বিজ্ঞানীর অক্ষয় কীর্তিকে বহন করে চলেছে।

১৯৭৪, ৪ঠা ফেব্রুয়ারির প্রত্যুষে, বিশ্ব চরাচর যখন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সেই প্রশান্ত মুহূর্তে বিশ্রুত কীর্তি, মানবতাবাদী বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস লোকান্তরিত হন।

মেঘনাদ সাহা

(১৮৯৩-১৯৫৬)

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এদেশে বিজ্ঞানচর্চার স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। এই দুইজনের নিজ নিজ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানজগতে ভারতের আসন, বহু বহু কাল বাদে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে যেসব বিজ্ঞানী আপন আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রতিভাধর পদার্থবিজ্ঞানী তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদানে বিজ্ঞানজগতে ভারতের মুখ আরো উজ্জ্বল করেছেন। এই দুজনকেও ভারতে বর্তমান বিজ্ঞান-যুগের অন্যতম পথিকৃৎ বলা চলে। মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেই ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি রত্ন। উভয়েরই ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন আগা-গোড়া সমান দেদীপ্যমান ছিল। আবার এঁরা দুজনেই ছিলেন সহপাঠী ও বন্ধু। দুজনেই একসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যপনা শুরু করেন এবং পরবর্তিকালে তাঁরা দুজনে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আধুনিক ভারতের বৈজ্ঞানিক সাধনার ইতিহাসে এই দুটি নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

১৮৯৩, ৬ অক্টোবর ঢাকার একটি গ্রামে একটি সঙ্গতিবিহীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মেঘনাদ সাহা। তিনি তাঁর মাতাপিতার পঞ্চম সন্তান ছিলেন। ভাইবোন মিলে তাঁর আটজন। বাবা জগন্নাথ সাহার ছিল একটি সামান্য মুদীর দোকান; তাঁর কিছুমাত্র আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না—কোন রকমে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চলত। সেইজন্য মেঘনাদকে খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে

হয়েছিল। গ্রামে কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না ; সাত মাইল দূরে অপর একটি গ্রামে ছিল একটি মিড্‌ল (Middle) স্কুল। সেই গ্রামের অনন্তকুমার দাস নামে এক চিকিৎসকের বদান্যতায় বালক মেঘনাদ এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁরই বাড়িতে থেকে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। মিড্‌ল স্কুল পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই কৃতিত্বের জন্য তিনি সরকারী বৃত্তিলাভ করেন।

স্কলারশিপ পাওয়ার ফলে তিনি উচ্চ স্কুলে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি ঢাকায় এসে সরকারী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে এই বছরটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে বঙ্গভঙ্গ জনিত আন্দোলনের জন্য। সেই আন্দোলনের উত্তাপ অন্যান্য ছাত্রদের মতো তরুণ মেঘনাদকেও স্পর্শ করেছিল। লাটসাহেব স্কুল পরিদর্শনে আসবেন—ছাত্ররা স্কুল বয়কট করল এই উপলক্ষ্যে। ফলে মেঘনাদের স্কলারশিপ কাটা গেল এবং অন্যান্য ছাত্রদের মতো তিনিও স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন। তখন তিনি স্থানীয় একটি বেসরকারী স্কুলে ভর্তি হলেন এবং ১৯০৯ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন ; পূর্ববঙ্গের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল তালিকার শীর্ষদেশে। ১৯১১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই. এস. সি. পরীক্ষায় সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন, কিন্তু গণিত ও রসায়নে প্রথম হয়েছিলেন। এই কারণে তখন থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল ছাত্রসমাজে 'মেঘনাদ সাহা' নামটি সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তাঁর একটি বিষয় ছিল জার্মাণ ভাষা—যদিও ঢাকা কলেজে তখন এর পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা ছিলনা।

অতঃপর মেঘনাদ কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। এইখানে তাঁর সহপাঠীরূপে তিনি যাঁদের পেয়েছিলেন

তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন বোস, জ্ঞান মুখার্জি, জ্ঞান ঘোষ, নীলরতন ধর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। উত্তরকালে এঁরা প্রত্যেকেই যশস্বী বিজ্ঞানীরূপে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু আর প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। শিক্ষক ও ছাত্র মিলে এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে যেন চাঁদের হাট বসেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে এতগুলি মেধাবী বিজ্ঞানের ছাত্রের সমাবেশ এর আগে বা পরে আর কখনো দেখা যায়নি।

১৯১৩ সালে বি. এস. সি. পরীক্ষায় গণিত অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করলেন সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় মেঘনাদ। এঁরা দুজনেই মিশ্র গণিত নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এস. সি পড়েন। এম. এস. সি. ক্লাসে অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক, অধ্যাপক জে. এম. বোস, অধ্যাপক কালিস (Cullis) প্রভৃতিকে তাঁরা শিক্ষকরূপে পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গণিত শিক্ষক মহলে এঁদের খ্যাতি ছিল সমধিক। ১৯১৫ সালে এম. এস. সি. পরীক্ষায় মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্র-নাথের ফল পূর্ববৎ সত্যেন্দ্রনাথ হলেন প্রথম, মেঘনাদ দ্বিতীয়।

কৃতিত্বের সঙ্গে ছাত্রজীবন শেষ করে, মেঘনাদের ইচ্ছা ছিল যে তিনি একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবেন। আই. এফ. এস. অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ফিনান্স সার্ভিসের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু সরকারী অনুমতি মিলল না। তখন তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক গণিতে গবেষণা কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করবেন প্রতিজ্ঞা করেন। কলকাতায় পাঠ্যাবস্থায় তিনি প্রাইভেট টিউসানি করে পড়ার খরচ চালাতেন। একসঙ্গে কখনো কখনো তিনটি টিউসানি পর্যন্ত করতেন, এই শহরের তিনটি দূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে; সেজন্য তিনি সাইকেলে চড়ে টিউসানিতে যেতেন।

এই সময় স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীর উদ্যোগে এবং প্রধানত বাংলার শিক্ষাজগতের দুই দানবীর স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের দানকে কেন্দ্র করে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট স্থাপন করলেন বিজ্ঞান কলেজ ৯২ নম্বর আপার সারকুলার রোডে (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)। বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হয় ১৯১৭ সাল থেকে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপযুক্ত অর্থ ও বন্দোবস্তের অভাবে এতকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস. সি. শ্রেণীতে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথের মুখে এই গ্রন্থের লেখক একবার শুনেছিলেন যে, ১৯১৭ সালে একদিন স্যার আশুতোষ সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হলে তাঁরা পড়াতে পারবেন কিনা। দুই বন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন পারবেন। তখন স্যার আশুতোষ বললেন, তার আগে তা হলে তাঁদের একবছর পড়ে নিতে হবে। তখন দুজনের জন্য দুটি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। এক বছর বিশেষ পাঠ গ্রহণের পর মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয় বিভাগেই লেকচারার নিযুক্ত হলেন। দুজনে মিলে পদার্থবিদ্যার বিভাগটি সংগঠনের ভার নিলেন। উচ্চতর পদার্থবিদ্যা পঠনপাঠন ও গবেষণায় তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রথম ফল স্বরূপ গ্যাসীয়পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে একটি মৌলিক না হলেও মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হলো লণ্ডনের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন। এই নিবন্ধে তাঁরা যে সূত্র প্রমাণ করেন সেটি 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ' (Saha-Bose Equation of State) নামে সুপরিচিত। ১৯২০ সাল পর্যন্ত মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার রূপে একযোগে কাজ করেছিলেন।

বিজ্ঞান জগতে তখন আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কার আপেক্ষিকতাবাদ এসে গিয়েছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত-কাল পরেই এই নতুন তত্ত্বের প্রমাণও বিঘোষিত হয়েছে। কলকাতায়

এই সংবাদ যখন পৌঁছল তখন মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ (দুজনেই তখন বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার পদে নিযুক্ত ছিলেন) আপেক্ষিকতাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে এই তত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধ মূল জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষাতে অনুবাদ করেন। এই অনূদিত নিবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি ছিল আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ। আপেক্ষিকতাবাদের অনুশীলন করতে গিয়ে মেঘনাদ তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং এই সম্পর্কে তাঁর প্রথম মৌলিক নিবন্ধ 'On Maxwell's Stresses' ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এজন্য বিজ্ঞানাচার্য (D. S.c.) উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিজ্ঞান কলেজে অধ্যপনা করবার সময় সাহা ছাত্রসুলভ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে মেঘনাদ বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়, বিশেষ করে spectroscopy ও thermodynamics, সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে থাকেন। তাপবিজ্ঞান সম্পর্কে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের Thermodynamics বইটি তিনি খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করেন। পড়লেন নার্নস্ট-এর Das New Warmesatz এবং কোয়াণ্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে বই। এই প্রকার অধ্যয়নের ফলেই মেঘনাদ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকেন তাঁর যুগান্তরকারী ভাবী আবিষ্কারের পথে—যে আবিষ্কার তাঁকে বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল।

বিজ্ঞানের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে—Thermal Ionization of elements—তাঁর অপূর্ব প্রতিভা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল।

১৯১৯। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেঘনাদকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ প্রদান করেন। স্কলারশিপের টাকা দিয়ে তিনি ইউরোপ যান ও সেখানে দু'বছর অবস্থান করেন। তাঁর উদ্ভাবিত আয়োনাই-

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট স্থাপন করলেন বিজ্ঞান কলেজ ৯২ নম্বর আপার সারকুলার রোডে (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)। বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হয় ১৯১৭ সাল থেকে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপযুক্ত অর্থ ও বন্দোবস্তের অভাবে এতকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস. সি. শ্রেণীতে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথের মুখে এই গ্রন্থের লেখক একবার শুনেছিলেন যে, ১৯১৭ সালে একদিন স্যার আশুতোষ সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হলে তাঁরা পড়াতে পারবেন কিনা। দুই বন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন পারবেন। তখন স্যার আশুতোষ বললেন, তার আগে তা হলে তাঁদের একবছর পড়ে নিতে হবে। তখন দুজনের জন্য দুটি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। এক বছর বিশেষ পাঠ গ্রহণের পর মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয় বিভাগেই লেকচারার নিযুক্ত হলেন। দুজনে মিলে পদার্থবিদ্যার বিভাগটি সংগঠনের ভার নিলেন। উচ্চতর পদার্থবিদ্যা পঠনপাঠন ও গবেষণায় তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রথম ফল স্বরূপ গ্যাসীয়পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে একটি মৌলিক না হলেও মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হলো লণ্ডনের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন। এই নিবন্ধে তাঁরা যে সূত্র প্রমাণ করেন সেটি 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ' (Saha-Bose Equation of State) নামে সুপরিচিত। ১৯২০ সাল পর্যন্ত মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার রূপে একযোগে কাজ করেছিলেন।

বিজ্ঞান জগতে তখন আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কার আপেক্ষিকতাবাদ এসে গিয়েছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত-কাল পরেই এই নতুন তত্ত্বের প্রমাণও বিঘোষিত হয়েছে। কলকাতায়

এই সংবাদ যখন পৌঁছল তখন মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ (দুজনেই তখন বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার পদে নিযুক্ত ছিলেন) আপেক্ষিকতাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে এই তত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধ মূল জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষাতে অনুবাদ করেন। এই অনুদিত নিবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি ছিল আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ। আপেক্ষিকতাবাদের অনুশীলন করতে গিয়ে মেঘনাদ তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং এই সম্পর্কে তাঁর প্রথম মৌলিক নিবন্ধ 'On Maxwell's Stresses' ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এজন্য বিজ্ঞানাচার্য (D. S.c.) উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিজ্ঞান কলেজে অধ্যপনা করবার সময় সাহা ছাত্রসুলভ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে মেঘনাদ বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়, বিশেষ করে spectroscopy ও thermodynamics, সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে থাকেন। তাপবিজ্ঞান সম্পর্কে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের Thermodynamics বইটি তিনি খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করেন। পড়লেন নার্নস্ট-এর Das New Warmesatz এবং কোয়াণ্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে বই। এই প্রকার অধ্যয়নের ফলেই মেঘনাদ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকেন তাঁর যুগান্তরকারী ভাবী আবিষ্কারের পথে— যে আবিষ্কার তাঁকে বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল।

বিজ্ঞানের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে—Thermal Ionization of elements—তাঁর অপূর্ব প্রতিভা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল।

১৯১৯। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেঘনাদকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ প্রদান করেন। স্কলারশিপের টাকা দিয়ে তিনি ইউরোপ যান ও সেখানে দু'বছর অবস্থান করেন। তাঁর উদ্ভাবিত আয়োনাই-

জেসন তত্ত্ব (Ionization theory) সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই ছিল তাঁর ইউরোপ গমনের প্রধান উদ্দেশ্য। লণ্ডনে কয়েক মাস অধ্যাপক এ. ফাউলারের অধীনে তিনি কাজ করেন এবং ১৯২১ সালে রয়্যাল সোসাইটিতে তাঁর যে প্রবন্ধটি গৃহীত হয়েছিল, তার পিছনে ছিল ফাউলারের সুপারিশ। তারপর তিনি বার্লিনে এসে ডাবলু. নার্নস্ট-এর ল্যাবোরেটরিতে তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা করেন। কিন্তু চূড়ান্ত ফল তখন পাওয়া যায় নি।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মেঘনাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপকের পদে* নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপরেই আমরা এই তরুণ বিজ্ঞানীকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে দেখি বিভাগীয় প্রধান হিসাবে। তাঁর কর্মজীবনে শুরু হয় এক নতুন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দীর্ঘ পনর বৎসরকাল (১৯২৩-৩৮) তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে পুরাতন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যখন নতুনভাবে সংগঠিত হয় তখন পদার্থবিদ্যার জন্য একজন প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিদের অন্বেষণ চলতে থাকে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ছিলেন এ. সি. ব্যানার্জি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে মেঘনাদ সাহার বিভাগীয় প্রধান পদে নিয়োগ বিনা বাধায় হতে পারেনি। দলীয় রাজনীতি আর ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রণোদিত হয়ে ক্ষমতাশালী বিরুদ্ধবাদীরা মেঘনাদের নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন এই কারণ দেখিয়ে যে, তিনি F. R. S. নন আর তাঁর ডিগ্রী গণিতে, পদার্থবিদ্যায় নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইন ও এডিংটনের অভিমতই জয়লাভ

* খয়রার রাজা কুমার গুরুপ্রসাদ সিং-এর টাকায় এই পদটির সৃষ্টি হয়েছিল। মেঘনাদ সাহাই ছিলেন প্রথম খয়রা অধ্যাপক।

করেছিল এবং অবশেষে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং এটা গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়েছিল। যে পনর বছর মেঘনাদ এখানে বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময় তত্ত্বীয় পদার্থবিদের একটি নবীন গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। মোটকথা, বিজ্ঞানের পঠন পাঠনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছাত্রদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল তার সকল কৃতিত্বই ছিল একটি মানুষের। তিনি ডঃ মেঘনাদ সাহা। তাঁরই আমন্ত্রণে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন ১৯৩৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি মুক্তকণ্ঠে এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিভার প্রশংসা করে বলেছিলেনঃ 'অধ্যাপক সাহার তুল্য প্রতিভা যে কোন দেশেরই গৌরবের পাত্র।' একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

১৯৩৮। সাহা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তখন থেকে পরবর্তী চৌদ্দ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বে এই পদে নিযুক্ত ছিলেন ভেঙ্কট রামন; তিনি ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর হয়ে চলে যাওয়ার ফলে এই পদটি কিছুকাল শূন্য ছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কর্মশক্তি ও প্রেরণা নিয়ে মেঘনাদ বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার পঠন-পাঠন ও গবেষণার উন্নতি বিধান করেন এবং এম. এস. সি. ক্লাসে বিশুদ্ধ পদার্থ-বিদ্যার পাঠক্রম ঢেলে সাজালেন। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। সেই বয়সে তিনি পাঠ্যতালিকায় একটি নতুন বিষয় সংযোজন করলেন যা এ পর্যন্ত ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয় নি। সেই বিষয়টি হল nuclear physics বা পরমাণু সম্পর্কিত পদার্থ-বিদ্যা। আবার সেই একই সময়ে তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

জেসন তত্ত্ব (Ionization theory) সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই ছিল তাঁর ইউরোপ গমনের প্রধান উদ্দেশ্য। লণ্ডনে কয়েক মাস অধ্যাপক এ. ফাউলারের অধীনে তিনি কাজ করেন এবং ১৯২১ সালে রয়্যাল সোসাইটিতে তাঁর যে প্রবন্ধটি গৃহীত হয়েছিল, তার পিছনে ছিল ফাউলারের সুপারিশ। তারপর তিনি বার্লিনে এসে ডাবলু. নার্নস্ট-এর ল্যাবোরেটরিতে তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা করেন। কিন্তু চূড়ান্ত ফল তখন পাওয়া যায় নি।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মেঘনাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপকের পদে* নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপরেই আমরা এই তরুণ বিজ্ঞানীকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে দেখি বিভাগীয় প্রধান হিসাবে। তাঁর কর্মজীবনে শুরু হয় এক নতুন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দীর্ঘ পনর বৎসরকাল (১৯২৩-৩৮) তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে পুরাতন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যখন নতুনভাবে সংগঠিত হয় তখন পদার্থবিদ্যার জন্য একজন প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিদের অন্বেষণ চলতে থাকে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ছিলেন এ. সি. ব্যানার্জি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে মেঘনাদ সাহার বিভাগীয় প্রধান পদে নিয়োগ বিনা বাধায় হতে পারেনি। দলীয় রাজনীতি আর ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রণোদিত হয়ে ক্ষমতাশালী বিরুদ্ধবাদীরা মেঘনাদের নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন এই কারণ দেখিয়ে যে, তিনি F. R. S. নন আর তাঁর ডিগ্রী গণিতে, পদার্থবিদ্যায় নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইন ও এডিংটনের অভিমতই জয়লাভ

* খয়রার রাজা কুমার গুরুপ্রসাদ সিং-এর টাকায় এই পদটির সৃষ্টি হয়েছিল। মেঘনাদ সাহাই ছিলেন প্রথম খয়রা অধ্যাপক।

করেছিল এবং অবশেষে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং এটা গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়েছিল। যে পনর বছর মেঘনাদ এখানে বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময় তত্ত্বীয় পদার্থবিদের একটি নবীন গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। মোটকথা, বিজ্ঞানের পঠন পাঠনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছাত্রদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল তার সকল কৃতিত্বই ছিল একটি মানুষের। তিনি ডঃ মেঘনাদ সাহা। তাঁরই আমন্ত্রণে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন ১৯৩৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি মুক্তকণ্ঠে এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিভার প্রশংসা করে বলেছিলেনঃ 'অধ্যাপক সাহার তুল্য প্রতিভা যে কোন দেশেরই গৌরবের পাত্র।' একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

১৯৩৮। সাহা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তখন থেকে পরবর্তী চৌদ্দ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বে এই পদে নিযুক্ত ছিলেন ভেঙ্কট রামন; তিনি ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর হয়ে চলে যাওয়ার ফলে এই পদটি কিছুকাল শূন্য ছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কর্মশক্তি ও প্রেরণা নিয়ে মেঘনাদ বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার পঠন-পাঠন ও গবেষণার উন্নতি বিধান করেন এবং এম. এস. সি. ক্লাসে বিশুদ্ধ পদার্থ-বিদ্যার পাঠক্রম ঢেলে সাজালেন। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। সেই বয়সে তিনি পাঠ্যতালিকায় একটি নতুন বিষয় সংযোজন করলেন যা এ পর্যন্ত ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয় নি। সেই বিষয়টি হল nuclear physics বা পরমাণু সম্পর্কিত পদার্থ-বিদ্যা। আবার সেই একই সময়ে তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এর গবেষণাগারটির উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর পরিশ্রম করবার।

মেঘনাদ কলকাতায় আসার এক দশকের মধ্যে ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতালাভ সমকালীন ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেই সময় দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যা—পূর্ববঙ্গ (পাকিস্থান) থেকে হাজার হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু নর-নারী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। এর ফলে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। মেঘনাদ পূর্ববঙ্গের মানুষ। তিনি এই ব্যাপারে যারপর নাই বিচলিত হন এবং এই সমস্যার সমাধান কল্পে অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের জন্য এগিয়ে আসেন। একটা বিরাট মানবিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই প্রৌঢ় বিজ্ঞানী তাঁর সময় ও শক্তির অনেকখানি নিয়োজিত করেছিলেন সেদিন। মেঘনাদের এই অপূর্ব মানবিকতাবোধ তাঁর চরিত্রকে সেদিন এক নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছিল।

ষাট বছর বয়সে অধ্যাপক সাহা বিজ্ঞান কলেজের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তখন ইম্যারিটাস প্রফেসর (Emeritus Professor) পদে নির্বাচন করেন। (তাঁর বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথকেও অনুরূপ সম্মান দেখান হয়েছিল।) ১৯৫২ সালে তাঁর ভাগ্যে আর একটি সম্মানলাভ ঘটল—তিনি এসোসিয়েশন অফ কালটিভেশন অব সায়ান্সের সর্বক্ষণের জন্য পরিচালক নিযুক্ত হলেন। এই পদটি সৃষ্টি হওয়ার পর তিনিই এর প্রথম পরিচালক হয়েছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে চার বৎসর কাল তিনি এই দায়িত্বজনক পদে অধিষ্ঠিত থেকে এর গবেষণাগারটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

মেঘনাদ সাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি-ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (বর্তমানে তাঁরই নামানুসারে এটি এখন 'সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' নাম পরিচিত।) এলাহাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা এবং তাঁরই নিজস্ব গবেষণাগার থেকে এর সূচনা। বিজ্ঞান কলেজের পিছনের একখণ্ড জমিতে ১৯৫০ সালের ১১ই জানুয়ারি ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব ভবনের শিলান্যাস করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে যেসব প্রখ্যাত বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ম্যাডাম কুরীর কন্যা অধ্যাপক ম্যাডাম জোলিয়ট কুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই ইনষ্টিটিউটকে অধ্যাপক সাহার এক অক্ষয় কীর্তি হিসাবে গণ্য করা যায়, কারণ এইভাবেই তিনি সেদিন ভারতবর্ষকে বিশ্বের পারমানবিক মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছিলেন: Prof. Saha is one of those who pioneered atomic research in India.' এই উক্তি অতিশয়োক্তি ছিল না।

এদেশে জাতীয় পরিকল্পনার (National planning) ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান সামান্য ছিল না। স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রকার উন্নয়নের জন্য এই মানুষটির মস্তিষ্ক সর্বদা আলোড়িত হত। বিজ্ঞানের এই প্রখর যুগে ভারতবাসীর মনে বৈজ্ঞানিক চেতনা জাগ্রত করে দেওয়ার জন্য তাঁর চিন্তা ও কর্মের যেন বিরাম ছিল না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে তাঁর মতো একজন বহুমুখী প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর মৃত্যু দেশ এবং জাতির পক্ষে পরম ক্ষতি বলে মনে করেছিলেন সকলেই। দেশ-বিদেশের বহু বিদ্বদসমিতি থেকে তিনি অপর্যাপ্ত সম্মান লাভ করেছিলেন—সে সম্মানের তালিকা সুদীর্ঘ। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এ তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ১৯২৭ সালে মেঘনাদকে 'ফেলো' নির্বাচিত করেন।

১৯৫৬, ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই কীর্তিমান বিজ্ঞানীর জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়।

ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এর গবেষণাগারটির উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর পরিশ্রম করবার।

মেঘনাদ কলকাতায় আসার এক দশকের মধ্যে ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতালাভ সমকালীন ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেই সময় দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যা—পূর্ববঙ্গ (পাকিস্থান) থেকে হাজার হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু নর-নারী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। এর ফলে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। মেঘনাদ পূর্ববঙ্গের মানুষ। তিনি এই ব্যাপারে যারপর নাই বিচলিত হন এবং এই সমস্যার সমাধান কল্পে অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের জন্য এগিয়ে আসেন। একটা বিরাট মানবিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই প্রৌঢ় বিজ্ঞানী তাঁর সময় ও শক্তির অনেকখানি নিয়োজিত করেছিলেন সেদিন। মেঘনাদের এই অপূর্ব মানবিকতাবোধ তাঁর চরিত্রকে সেদিন এক নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছিল।

ষাট বছর বয়সে অধ্যাপক সাহা বিজ্ঞান কলেজের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তখন ইম্যারিটাস প্রফেসর (Emeritus Professor) পদে নির্বাচন করেন। (তাঁর বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথকেও অনুরূপ সম্মান দেখান হয়েছিল।) ১৯৫২ সালে তাঁর ভাগ্যে আর একটি সম্মানলাভ ঘটল—তিনি এসোসিয়েশন অফ কালটিভেশন অব সায়ান্সের সর্বক্ষণের জন্য পরিচালক নিযুক্ত হলেন। এই পদটি সৃষ্টি হওয়ার পর তিনিই এর প্রথম পরিচালক হয়েছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে চার বৎসর কাল তিনি এই দায়িত্বজনক পদে অধিষ্ঠিত থেকে এর গবেষণাগারটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

মেঘনাদ সাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি-ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (বর্তমানে তাঁরই নামানুসারে এটি এখন 'সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' নাম পরিচিত।) এলাহাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা এবং তাঁরই নিজস্ব গবেষণাগার থেকে এর সূচনা। বিজ্ঞান কলেজের পিছনের একখণ্ড জমিতে ১৯৫০ সালের ১১ই জানুয়ারি ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব ভবনের শিলান্যাস করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে যেসব প্রখ্যাত বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ম্যাডাম কুরীর কন্যা অধ্যাপক ম্যাডাম জোলিয়ট কুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই ইনষ্টিটিউটকে অধ্যাপক সাহার এক অক্ষয় কীর্তি হিসাবে গণ্য করা যায়, কারণ এইভাবেই তিনি সেদিন ভারতবর্ষকে বিশ্বের পারমানবিক মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছিলেন: Prof. Saha is one of those who pioneered atomic research in India.' এই উক্তি অতিশয়োক্তি ছিল না।

এদেশে জাতীয় পরিকল্পনার (National planning) ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান সামান্য ছিল না। স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রকার উন্নয়নের জন্য এই মানুষটির মস্তিষ্ক সর্বদা আলোড়িত হত। বিজ্ঞানের এই প্রখর যুগে ভারতবাসীর মনে বৈজ্ঞানিক চেতনা জাগ্রত করে দেওয়ার জন্য তাঁর চিন্তা ও কর্মের যেন বিরাম ছিল না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে তাঁর মতো একজন বহুমুখী প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর মৃত্যু দেশ এবং জাতির পক্ষে পরম ক্ষতি বলে মনে করেছিলেন সকলেই। দেশ-বিদেশের বহু বিদ্বদসমিতি থেকে তিনি অপর্যাপ্ত সম্মান লাভ করেছিলেন—সে সম্মানের তালিকা সুদীর্ঘ। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এ তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ১৯২৭ সালে মেঘনাদকে 'ফেলো' নির্বাচিত করেন।

১৯৫৬, ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই কীর্তিমান বিজ্ঞানীর জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়।

ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

(১৯০৯-১৯৬৬)

তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টারে (BARC) অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী রাজা রামন্না বলেছিলেন ঃ 'Dr. Homi Jehangir Bhabha was the father and architect of India's nuclear programme. If India today ranks among the first six countries in the world in the field of nuclear science, the credit undoubtedly goes to him.' পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা সম্পর্কে এই উক্তি সর্বতোভাবে সত্য। বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর অকালমৃত্যু না ঘটলে হয়ত ইলেকট্রনিক্স-এর ক্ষেত্রেও ভাবা তাঁর অবদান রেখে যেতে পারতেন। স্বাধীন ভারতকে বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধরের মর্যাদা দিয়েছেন তিনি—এই যে আজ আমরা পরমাণুর যুগে পৌঁছে গেছি, এর সকল কৃতিত্ব ডক্টর ভাবার। বিজ্ঞানের এই মহাশক্তিকে সমাজ কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নে প্রয়োগ করার কথা পৃথিবীতে তিনি প্রথম বলেছেন।

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ শতকের সূচনায় বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন যখন জড় ও শক্তিকে পরস্পরের পরিপূরক নির্দেশ করে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং জড়বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় আলোচনায় যুগান্তর আনেন—বিজ্ঞানের সেই বিস্ময়কর যুগের সন্তান ছিলেন ভাবা।

১৯০৯, ৩০শে অক্টোবর। বোম্বাইয়ের এক বিত্তবান, শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ভাবা। এই পরিবারটি পুরুষানুক্রমে বিত্তশালী ও শিক্ষিত। পিতামহ ছিলেন মহীশূর রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্ত্তা আর পিতা একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী; তিনি টাটা প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে আইনের পরামর্শদাতা হিসাবে দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে পরবর্তীকালে এই দুই পরিবারের মধ্যে একটা হৃদ্যতার ভাব গড়ে উঠেছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বাধীন ভারতের পরমাণুবিজ্ঞানের জনক।

হোমির বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার পিতামহ কিছুদিনের জন্য পৌত্রকে মহীশূরে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক লেখাপড়াটা সেখানেই হয়েছিল। অল্পদিন পরে বৃদ্ধ ভাবা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের বংশে একটি অসাধারণ প্রতিভাবান ছেলে এসেছে। ছেলেবেলায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল বালক ভাবার মধ্যে; যথা,—ঘুম ছিলনা বললেই হয়, গান শুনলেই কান দুটি খাড়া হতো, গানের আওয়াজ কোথাও শুনতে পেয়েছে কি অমনি স্থির হয়ে সেটি শুনত। ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রতি তার ছিল প্রবল আকর্ষণ ঐ বয়স থেকেই। সে খুব ভালো ছবি আঁকতে পারত আর ড্রয়িং করতে পারত। তাঁর ঐ বয়সের আঁকা ছবিগুলিও দেখতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতো। তাই অনেকের মতে ভাবা যদি বিজ্ঞানের বদলে চারুশিল্পের দিকে যেতেন তাহলে তিনি একজন উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে পারতেন।

ভাবার পিতামাতা দুজনেই শিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের এই পুত্রটির জন্য তাঁরা সব সময়েই একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সচেষ্ট থাকতেন। ছেলের স্কুল যাবার বয়স হলে প্রথমে তাকে একটি মিশনারি স্কুলে—বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল হাইস্কুলে পাঠানো হয়। এখানে দু'বছর পড়ার পর ভাবাকে জন কনোন নামে আর একটি মিশনারি স্কুলে পাঠানো হয়। এই দুই স্কুলেই তাঁর ছাত্রজীবন

খুবই দেদীপ্যমান ছিল—অনেকগুলি প্রাইজও পেয়েছিলেন তিনি। বলতে গেলে অজস্র পুরস্কার আর পারিতোষিকের ভিতর দিয়ে ভাবার সমস্ত ছাত্রজীবনটা অতিবাহিত হয়েছিল।

পিতামাতা দুজনেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁদের এই ছেলের স্বাভাবিক প্রবণতা বিজ্ঞানের দিকে এবং এর থেকেই তাঁদের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, বড় হলে এ নিশ্চয়ই বড়দরের একজন বিজ্ঞানী হবে। তাঁদের এই ধারণা আশ্চর্যভাবেই সফল হয়েছিল। বিজ্ঞানের প্রতি ছেলের আগ্রহ যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য তাঁরা বাড়িতেই একটা লাইব্রেরী করে দিয়েছিলেন—সেই লাইব্রেরীটি শুধু বিজ্ঞান আর কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কিত বইতে পূর্ণ ছিল। সেসব বইয়ের ষোল আনা সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। সেইসঙ্গে পিথাগোরাস, ইউক্লিড, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের জীবনী পাঠ করে, তিনি কল্পনা করতেন—বড় হয়ে তিনিও একজন বিজ্ঞানী হবেন।

পনর বছর বয়সে ভাবা সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা পাশ করলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম তো হয়েই ছিলেন, এমন কি প্রত্যেকটি বিষয়েও তাঁরই ছিল প্রথম স্থান। অতঃপর তাঁকে এলফিনস্টোন কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো বিখ্যাত বোম্বাইয়ের এই কলেজটি। এখানে কিছুকাল পড়ার পর ভাবা ভর্তী হলেন এখানকার রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়, সেইজন্য তাকে এইখানে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল।

ইনষ্টিটিউটে দু'বছর পড়া শেষ হলে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভাবাকে বিলেত পাঠানো হল। সেখানে তিনি প্রবিষ্ট হলেন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে গণ্য হলেন। অধ্যাপকরা এই তরুণ ভারতীয় ছাত্রটির প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন। ১৯৩০ সালে তিনি

ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইপস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। ভাবার বয়স তখন মাত্র একুশ বছর ছিল। কেম্‌ব্রিজে তিনি অনেকগুলি স্কলারশিপ লাভ করেছিলেন। এক সঙ্গে পাঁচ-পাঁচটি বিষয় নিয়ে পাশ করে ভাবা কেম্‌ব্রিজে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

ছাত্র হয়ে ইংলণ্ডে এসে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভাবার বহুমুখী আগ্রহ চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ এসেছিল। কলেজের গ্রন্থাগারে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। পরীক্ষায় তাঁর সাফল্যের সংবাদ যখন বোম্বাইতে এল তখন বাড়ির সকলেই, বিশেষ করে তাঁর বাবা, খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। টাটার ইস্পাত তৈরির কারখানায় দু'হাজার টাকা মাইনের একটি চাকরি তাঁর জন্য অবধারিত ছিল। তাই হোমির বাবা ছেলেকে সত্বর দেশে ফিরতে নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু হোমি তাঁর বাবাকে জানালেন যে, তাঁকে দুবছরের জন্য অঙ্কতে একটা স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। তিনি তাই এখনই দেশে ফিরতে পারবেন না। এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল মাসিক পঞ্চাশ পাউণ্ড। ভাবার আগে আর কোন ভারতীয় ছাত্র এই বৃত্তি লাভ করেন নি।

এই বৃত্তি পাওয়ার পর ভাবা প্রথমে জ্যুরিখে পাউলির অধীনে এবং পরে রোমে ফের্মির অধীনে গবেষণা করেন। এই বৃত্তির মেয়াদ শেষ হলে পরে, ১৯৩৩ সালে তাঁকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আর একটি বৃত্তি প্রদান করেন—স্যার আইজাক নিউটন স্টুডেন্টশিপ। খুব প্রতিভাবান ছাত্র ভিন্ন এই দুর্লভ বৃত্তি সচরাচর কোন ছাত্র লাভ করতে পারত না। এরপর তিনি তাঁর থিসিসের জন্য পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। এখন তিনি 'ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা'। অতঃপর তাঁকে আর একটি বৃত্তি দেওয়া হয়—'একজিবিশন স্টুডেন্টশিপ'। ১৯৩৬ সালে এই বৃত্তিলাভ করে, ভাবা কোপেনহেগেনে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী নীলস বোর-এর অধীনে গবেষণা করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলেন।

এইখানে অবস্থানকালে অধ্যাপক হাইটলারের সহযোগে তিনি মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে একটি নতুন তত্ত্বের সূচনা করেন; এটাই ছিল ভাবার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ।

এই মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯৩৮ সালে ভাবা লাভ করলেন অ্যাডামস্ পুরস্কার। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে জাহাঙ্গীর ভাবাই প্রথম এই সম্মানিত পুরস্কার লাভ করেন। ইউরোপের জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হয়ে প্রায় দশ বছর বাদে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে তাঁর জন্য একটি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছিল। হোমি ভাবা যথার্থই বিজ্ঞানলক্ষ্মীর সেবক ছিলেন। বিলেত থেকে যে মূল্যবান জ্ঞান-সম্পদ তিনি আহরণ করেছিলেন, দেশজননীর চরণে তাই তিনি অর্পন করেছিলেন। আজীবন অবিবাহিত থেকে, বিজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি দেশের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করবেন—এই ছিল তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, তিনি এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন। আমরা তাঁর জীবনের সেই আশ্চর্য কাহিনী বলব।

ভারতে তাঁর প্রথম কর্মস্থল ছিল ব্যাঙ্গালোরে ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এ। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী রামন তখন এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন; ১৯৪০ সালে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে একজন বিশেষ রীডার হিসাবে ভাবা এইখানে যোগদান করেন। ইউরোপে থাকবার সময় জার্মানিতে অধ্যাপক হাইটলারের অধীনে ভাবা মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে যে গবেষণা সুরু করেছিলেন, সেই গবেষণার কাজটা অসম্পূর্ণ ছিল; তাই ব্যাঙ্গালোর ইনস্টিটিউটে তিনি সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন।

১৯৪১ সালটি ভাবার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছর তিনি ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হলেন; দেশবাসী তাঁর এই গৌরবলাভে আনন্দিত হল। রীডার থেকে

তিনি অধ্যাপকের পদে উন্নীত হলেন ; ইনস্টিটিউটের পদার্থ বিজ্ঞানের বিভাগটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব রামন তাঁকে দিয়েছিলেন। সে দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে ভাবা তাঁর ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতের পরমাণু বিজ্ঞানীর পক্ষে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। ইংলণ্ডে থাকতেই তিনি প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন যে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তখন পদার্থবিদ্যার পঠন-পাঠনে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে পরমাণুকে। তখন থেকেই তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ় হতে থাকে যে, বিজ্ঞান জগতে একটি নতুন যুগ আসন্ন হয়ে এসেছে—Atomic Age বা পরমাণু যুগ। তখন থেকেই তিনি এই আশা পোষণ করতে থাকেন যে, তিনি একজন পরমাণু-বিজ্ঞানী হবেন। সেই সুযোগ এল ১৯৪৫ সালে।

ঐ বছরের জুন মাসে বোম্বাইতে দোরাবজী টাটা ট্রাস্টের অর্থানুকূল্যে এবং প্রধানত ভাবার প্রস্তাবক্রমে স্থাপিত হয় টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ। ভারতে এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সেই প্রথম এবং সরকারী অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। ভাবার পরিচালনায় ইনষ্টিটিউট অল্পদিনেই খ্যাতি লাভ করে। ভারতে আধুনিক পরমাণু যুগের সূচনা এইখানেই হয়েছিল। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মহাজাগতিক রশ্মি ও কণিকা-পদার্থবিদ্যা (Quantum Physics) সম্পর্কিত গবেষণার কাজে একদল উৎসাহী ও যোগ্য কর্মীদের এখানে সমবেত করেছিলেন।

টাটা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক হিসাবে ডক্টর ভাবার নাম যখন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে তখন একদিন তাঁর কাছে এল একটি অপ্রত্যাশিত আহ্বান। স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে ভাবাকে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করার জন্য ডেকে পাঠালেন তাঁর বাসভবনে।

তারপর নির্ধারিত সময় ও দিনে ভাবা এলেন ত্রিমূর্তি মার্গে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে। দু'ঘণ্টা ধরে চলেছিল দুজনের মধ্যে একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা।

পরবর্তী ইতিহাসে সুপরিচিত। ১৯৪৮ সালে লোকসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন—Atomic Energy Act—পাশ হয়। গঠিত হলো অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, স্থাপিত হয় অ্যাটমিক এনার্জি রিসার্চ এসটাব্লিশমেণ্ট এবং এইগুলিকে ঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য সকল দায়িত্ব অর্পিত হয় ভাবার উপর। প্রধানমন্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর উপর। যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি কেমব্রিজ থেকে দেশে ফিরেছিলেন, যে স্বপ্নকে চরিতার্থ করবার জন্য তিনি প্রথমে বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউটে রামনের অধীনে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলেন এবং পরে টাটা ইনস্টিটিউটে গঠন করে ভাবীকালের কর্মীদের তৈরী করেছিলেন —সেই তাঁর এতদিনকার পোষিত স্বপ্ন সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে। এটি গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ বছর।

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সাফল্যের মূলে ছিলেন তিনজন শীর্ষস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানী—ড. কে. কৃষ্ণান, ড. শান্তস্বরূপ ভাটনগর ও ড. হোমি ভাবা; এঁরা তিনজনেই ছিলেন F. R. S.। কিন্তু ট্রমবেতে যে সংস্থাটি ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল—অ্যাটমিক এনার্জি রিসার্চ সেণ্টার—তার সাফল্যের মূলে ছিল একটি মানুষের সংগঠনী প্রতিভা। তিনি হোমি ভাবা। যিনি এতকাল গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনিই এইবার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। ট্রমবের রিসার্চ সেণ্টারের কার্যসূচীর যাবতীয় পরিকল্পনা তিনিই রচনা করেছিলেন। ভাবাই ছিলেন এই গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক। এক বিরাট কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছিল ট্রমবেতে। তাঁরই সময়ে এই কেন্দ্রে 'অপ্সরা' নামে প্রথম রিঅ্যাক্টর তৈরি হয়েছিল। এটি তৈরি করার জন্য বাইরে থেকে একজনও বিশেষজ্ঞকে আনতে হয়নি;

দেশের বিজ্ঞানীদের সাহায্যেই ভাবা এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ১৯৬০ সালে কলম্বো প্ল্যান অনুসারে ট্রমবেতে ভারত-কানাডার যৌথ প্রয়াসে তৈরি হল দ্বিতীয় বৃহদাকার রিঅ্যাক্টর। এখানকার প্লুটোনিয়াম প্ল্যাণ্টটি (১৯৬৫) পারমাণবিক ভারতের একটি বড় দিকচিহ্ন। একে ভাবার অক্ষয় কীর্তিও বলা চলে। প্লুটোনিয়াম প্ল্যাণ্ট ভারতকে বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধরের মর্যাদা এনে দিয়েছে। শুধু এই একটি ব্যাপারেই সারা এশিয়ায় ভারতকে ঈর্ষার পাত্র করে দিয়ে গেছেন বিজ্ঞানী ভাবা।

১৯৬৬, ২৪শে জানুয়ারি, এক বিমান দুর্ঘটনায় ভাবার আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র ভারতে গভীর শোকের ছায়াপাত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি কমিশনের বৈঠকে যোগদান করবার জন্য ভাবা ভিয়েনা যাচ্ছিলেন। ২৪ জানুয়ারি সকালে আলপস্ পর্বতমালার মঁ ব্লাঁ পর্বতশৃঙ্গে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল। তুষার ঝড়ের মধ্যে নিপতিত হয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল—বিমানের ১১৭ জন আরোহী নিহত হয়েছিলেন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী এবং ভারতীয় পরমাণু কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, এফ. আর. এস.।

১৯৬৬, ২৫শে জানুয়ারি, ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভাবার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন : মানুষ ও সমাজের কল্যাণের জন্য পরমাণুকে শান্তির কাজে ব্যবহারের আবেদন জানিয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের চমৎকৃত করেছিলেন ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। তিনি ছিলেন আমাদের উজ্জ্বলতম বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজে যেমন অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি শত শত তরুণ বিজ্ঞানীদের তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে বিজ্ঞান জগতের এবং আমাদের দেশের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ ভারত, পারমাণবিক যুগের সঙ্গে, তাল রেখে অগ্রগণ্য দেশগুলির পাশেই যে রয়েছে যে শুধু তাঁর জন্য। হোমি ভাবার কাছে ভারতের ঋণ অপরিশোধ্য।'

বিক্রম আম্বালাল সারাভাই

(১৯১৯-১৯৭১)

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের দ্বিতীয় চেয়ারম্যান, ডক্টর সারাভাই ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন যুগে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হিসাবে তাঁর নামের মুদ্রাঙ্কিত করে দিতে পারতেন। স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টে যেদিন পারমাণবিক শক্তি আইন (Atomic Energy Act of 1948) পাশ হয় সেদিন আমাদের দেশ এক নতুন পথে পদক্ষেপ করেছিল। সেই পথে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে যে তিনজন তরুণ বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন কৃষ্ণাণ, ভাটনগর ও ভাবা ; এঁদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই পথের পথিক হয়ে এসেছিলেন আর একজন তরুণ বিজ্ঞানী—বিক্রম আম্বালাল সারাভাই। তাঁর পূর্বস্থূরিদের দৃষ্টান্ত তাঁকে গভীরভাবেই উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং মহাকাশ গবেষণার (Space research) ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন তিনি।

১৯১৯, ১২ই আগস্ট, আমেদাবাদে একটি বিত্তশালী শিল্পপতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের প্রথম মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই।

একটি প্রাথমিক স্কুলে পাঠ শেষ করে, আমেদাবাদের গুজরাট কলেজে তিনি প্রবিষ্ট হন। তারপর উচ্চশিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি কেমব্রিজের সেণ্ট জন্‌স কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে ট্রাইপস্ (Tripos) লাভ করেন। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন, কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

আরম্ভ হওয়ার ফলে গবেষণা অসমাপ্ত রেখে বিক্রম সারাভাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে অধ্যাপক রামনের অধীনে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। এখানে বিক্রমের গবেষণার বিষয় ছিল মহাজাগতিক রশ্মি। এখানে তখন হোমি ভাবাও ঐ একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন। রামন ও ভাবার মতো বিজ্ঞানী দুইজনের সংস্পর্শে আসার ফলে সারাভাইয়ের বৈজ্ঞানিক চেতনার যথেষ্ট প্রসার হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ প্রাথমিক অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আরো তিনটি নতুন বিষয় তাঁর অধ্যয়নের পরিধির মধ্যে গ্রহণ করেন, যথা,—Interplanetary Space, Solar-terrestrial relation-ships ও geomagnetism. তখনো পর্যন্ত ভারতীয় কোন বিজ্ঞানী এইসব বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেননি। বিক্রমের প্রথম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ 'Time Distribution of Cosmic Rays' ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের ১৯৪২ সালের কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিজ্ঞানী সমাজে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞান জগতে একটি নতুন প্রতিভার আবির্ভাবকে সকলেই সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল সেদিন।

১৯৪৫ সালে কেমব্রিজে প্রত্যাবর্তন করে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে সারাভাই তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং ১৯৪৭ সালে 'Cosmic Ray Investigations in Tropical Latitudes'—এই গবেষণা প্রবন্ধের ভিত্তিতে তিনি Ph. D. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি যখন পুণা আবহাওয়া বিভাগে কর্মরত ছিলেন, তখন থেকেই একটি রিসার্চ ল্যাবোরেটরি স্থাপন করার চিন্তা তিনি করতে থাকেন, যেখানে মহাজাগতিক রশ্মি ও বায়ুরাশি সংক্রান্ত গবেষণা করা যেতে পারবে। পুণা মানমন্দিরের

বিক্রম আম্বালাল সারাভাই

(১৯১৯-১৯৭১)

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের দ্বিতীয় চেয়ারম্যান, ডক্টর সারাভাই ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন যুগে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হিসাবে তাঁর নামের মুদ্রাঙ্কিত করে দিতে পারতেন। স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টে যেদিন পারমাণবিক শক্তি আইন (Atomic Energy Act of 1948) পাশ হয় সেদিন আমাদের দেশ এক নতুন পথে পদক্ষেপ করেছিল। সেই পথে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে যে তিনজন তরুণ বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন কৃষ্ণাণ, ভাটনগর ও ভাবা ; এঁদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই পথের পথিক হয়ে এসেছিলেন আর একজন তরুণ বিজ্ঞানী—বিক্রম আম্বালাল সারাভাই। তাঁর পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত তাঁকে গভীরভাবেই উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং মহাকাশ গবেষণার (Space research) ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন তিনি।

১৯১৯, ১২ই আগস্ট, আমেদাবাদে একটি বিত্তশালী শিল্পপতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের প্রথম মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই।

একটি প্রাথমিক স্কুলে পাঠ শেষ করে, আমেদাবাদের গুজরাট কলেজে তিনি প্রবিষ্ট হন। তারপর উচ্চশিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি কেমব্রিজের সেন্ট জন্‌স কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে ট্রাইপস্ (Tripos) লাভ করেন। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন, কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

আরম্ভ হওয়ার ফলে গবেষণা অসমাপ্ত রেখে বিক্রম সারাভাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে অধ্যাপক রামনের অধীনে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। এখানে বিক্রমের গবেষণার বিষয় ছিল মহাজাগতিক রশ্মি। এখানে তখন হোমি ভাবাও ঐ একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন। রামন ও ভাবার মতো বিজ্ঞানী দুইজনের সংস্পর্শে আসার ফলে সারাভাইয়ের বৈজ্ঞানিক চেতনার যথেষ্ট প্রসার হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ প্রাথমিক অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আরো তিনটি নতুন বিষয় তাঁর অধ্যয়নের পরিধির মধ্যে গ্রহণ করেন, যথা,—Interplanetary Space, Solar-terrestrial relation-ships ও geomagnetism. তখনো পর্যন্ত ভারতীয় কোন বিজ্ঞানী এইসব বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেননি। বিক্রমের প্রথম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ 'Time Distribution of Cosmic Rays' ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের ১৯৪২ সালের কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিজ্ঞানী সমাজে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞান জগতে একটি নতুন প্রতিভার আবির্ভাবকে সকলেই সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল সেদিন।

১৯৪৫ সালে কেমব্রিজে প্রত্যাবর্তন করে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে সারাভাই তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং ১৯৪৭ সালে 'Cosmic Ray Investigations in Tropical Latitudes'—এই গবেষণা প্রবন্ধের ভিত্তিতে তিনি Ph. D. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি যখন পুণা আবহাওয়া বিভাগে কর্মরত ছিলেন, তখন থেকেই একটি রিসার্চ ল্যাবোরেটরি স্থাপন করার চিন্তা তিনি করতে থাকেন, যেখানে মহাজাগতিক রশ্মি ও বায়ুরাশি সংক্রান্ত গবেষণা করা যেতে পারবে। পুণা মানমন্দিরের

বিক্রম আম্বালাল সারাভাই

(১৯১৯-১৯৭১)

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের দ্বিতীয় চেয়ারম্যান, ডক্টর সারাভাই ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন যুগে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হিসাবে তাঁর নামের মুদ্রাঙ্কিত করে দিতে পারতেন। স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টে যেদিন পারমাণবিক শক্তি আইন (Atomic Energy Act of 1948) পাশ হয় সেদিন আমাদের দেশ এক নতুন পথে পদক্ষেপ করেছিল। সেই পথে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে যে তিনজন তরুণ বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন কৃষ্ণাণ, ভাটনগর ও ভাবা ; এঁদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই পথের পথিক হয়ে এসেছিলেন আর একজন তরুণ বিজ্ঞানী—বিক্রম আম্বালাল সারাভাই। তাঁর পূর্বস্থূরিদের দৃষ্টান্ত তাঁকে গভীরভাবেই উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং মহাকাশ গবেষণার (Space research) ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন তিনি।

১৯১৯, ১২ই আগস্ট, আমেদাবাদে একটি বিত্তশালী শিল্পপতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের প্রথম মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই।

একটি প্রাথমিক স্কুলে পাঠ শেষ করে, আমেদাবাদের গুজরাট কলেজে তিনি প্রবিষ্ট হন। তারপর উচ্চশিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি কেমব্রিজের সেণ্ট জন্‌স কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে ট্রাইপস্ (Tripos) লাভ করেন। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন, কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

আরম্ভ হওয়ার ফলে গবেষণা অসমাপ্ত রেখে বিক্রম সারাভাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে অধ্যাপক রামনের অধীনে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। এখানে বিক্রমের গবেষণার বিষয় ছিল মহাজাগতিক রশ্মি। এখানে তখন হোমি ভাবাও ঐ একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন। রামন ও ভাবার মতো বিজ্ঞানী দুইজনের সংস্পর্শে আসার ফলে সারাভাইয়ের বৈজ্ঞানিক চেতনার যথেষ্ট প্রসার হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ প্রাথমিক অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আরো তিনটি নতুন বিষয় তাঁর অধ্যয়নের পরিধির মধ্যে গ্রহণ করেন, যথা,—Interplanetary Space, Solar-terrestrial relation-ships ও geomagnetism. তখনো পর্যন্ত ভারতীয় কোন বিজ্ঞানী এইসব বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেননি। বিক্রমের প্রথম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ 'Time Distribution of Cosmic Rays' ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের ১৯৪২ সালের কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিজ্ঞানী সমাজে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞান জগতে একটি নতুন প্রতিভার আবির্ভাবকে সকলেই সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল সেদিন।

১৯৪৫ সালে কেমব্রিজে প্রত্যাবর্তন করে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে সারাভাই তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং ১৯৪৭ সালে 'Cosmic Ray Investigations in Tropical Latitudes'—এই গবেষণা প্রবন্ধের ভিত্তিতে তিনি Ph. D. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি যখন পুণা আবহাওয়া বিভাগে কর্মরত ছিলেন, তখন থেকেই একটি রিসার্চ ল্যাবোরেটরি স্থাপন করার চিন্তা তিনি করতে থাকেন, যেখানে মহাজাগতিক রশ্মি ও বায়ুরাশি সংক্রান্ত গবেষণা করা যেতে পারবে। পুণা মানমন্দিরের

ডিরেক্টর ড. কে. আর. রামনাথনের সঙ্গে এই নিয়ে সারাভাই আলোচনা করেন।

মহাজাগতিক রশ্মির প্রগাঢ়তা (intensity) পরিমাপ করার জন্য ১৯৪৩ সালে তিনি কাশ্মীরে হিমালয় শৃঙ্গ অভিযানে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার ফলে কাশ্মীরের একটি সুউচ্চ স্থানে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি তাঁর Ph. D. থিসিসটির পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর এই থিসিসের একস্থলে সারাভাই লিখেছিলেন : 'The Kasmir expedition has provided a great deal of experience in the performance of cosmic ray field experiments at high altitudes. It has also demonstrated the great need for the establishment of a permanent high altitudes laboratory in the Himalayas so that important scientific investigations can be carried out under satisfactory conditions. It is hoped therefore that by the co-operative efforts of scientists and the Government such a laboratory will be established soon.' লক্ষ্য করার বিষয়, সারাভাইয়ের পূর্বে আর কোন ভারতীয় বিজ্ঞানীর মনে এই জাতীয় চিন্তার উদয় হয়নি। অথচ তাঁর বয়স তখন তেইশ বছরও হয়নি। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে বয়সের দ্বারা প্রতিভার পরিমাপ হয় না।

বিক্রম সারাভাই-এর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁর চিন্তা-ভাবনার ব্যাপকতা যেমন ছিল, তেমনি সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। ১৯৪২ সালে যখন তিনি তাঁর নব-পরিণীতা স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনীকে নিয়ে পুণায় অবস্থান করছিলেন তখনই আমেদাবাদে একটি ফিজিক্যাল রিসার্চ

ল্যাবোরেটরি আরম্ভ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে কেমব্রিজ থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত কাল পরেই সারাভাই এজন্য একটি উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করতে থাকেন এবং অনেকের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিকল্পনাটি অনেকেরই মনঃপূত হয়। শ্রীকস্তুরভাই লালভাই, শ্রী এম. জি. মভলঙ্কর প্রমুখ আমেদাবাদ এডুকেশন সোসাইটির কয়েকজন সদস্য ল্যাবোরেটরি আরম্ভ করার জন্য তাঁকে এম. জি. সায়েন্স ইনষ্টিটিউটে তাঁকে কয়েকটি ঘর ছেড়ে দিলেন। প্রখ্যাত বায়ুবিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক রামনাথন ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরির প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন ; তিনি তখন সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। চার বছর বাদে ১৯৫২ সালে যখন এই ল্যাবোরেটরির নিজস্ব ভবন নির্মিত হয় তার শিলান্যাস করেন স্যার সি. ভি. রামন আর ১৯৫৪ সালে ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু। ভারতে এই জাতীয় গবেষণাগার সেই প্রথম এবং এটিকে সারাভাই তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা ও প্রয়াস দ্বারা গড়ে তুলেছিলেন। এই রিসার্চ ল্যাবোরেটরি —যা সংক্ষেপে PRL নামে পরিচিত—সারাভাই-এর একটি সার্থক সৃষ্টি। এই ল্যাবোরেটরির উদ্যোগেই ১৯৫৫ সালে কাশ্মীরের গুলমার্গে একটি রিসার্চ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল বায়ুমণ্ডলের ozone ও নৈশবায়ুর উত্তাপ এবং মহাজাগতিক রশ্মির প্রগাঢ়তা পরিমাপের জন্য। এই কেন্দ্রের সফলতা ও গুরুত্বপূর্ণ ফললাভ ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯৬৩ সালে গুলমার্গে স্থাপিত হয় একটি হাই অলটিচ্যুড রিসার্চ ল্যাবোরেটরি। ডক্টর সারাভাইয়ের দীর্ঘকালের পরিপোষিত পরিকল্পনা এত দিন বাদে সার্থক হয়। আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাসে তাই তাঁর PRL একটি বড় দিকচিহ্ন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, টাটা ইনস্টিটিউট যেমন ভারতে পারমাণবিক শক্তির কর্মসূচী প্রশস্ত করে দিয়েছিল, তেমনি ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরি ভারতে

মহাকাশ গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। এর প্রথমটি ছিল হোমি ভাবার প্রতিভার দান, দ্বিতীয়টি বিক্রম সারাভাইয়ের প্রতিভা ও উদ্যমপ্রসূত ছিল। ভারতবাসী মাত্রই তাই আজ এই দুই বিজ্ঞানীর জন্য গর্ব বোধ করবে আর তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে চিরকাল।

ভারতে ঔষধ তৈরি শিল্পে সারাভাই কেমিক্যালের নাম আজ সুবিদিত। বিজ্ঞানী সারাভাই গজদন্ত মিনারে বাস করতেন না— হস্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের গবেষণার রাজ্যে বাস করতেন না। বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান তাঁর কাম্য ছিল। পনর বছর যাবৎ তিনি একাগ্রভাবে ঔষধ তৈরি শিল্পটি সম্পর্কে চিন্তা করে এসেছেন এবং তাঁর মনের সংগোপনে এই ইচ্ছা লালন-পালন করে এসেছেন যে, এই শিল্পটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে উন্নত করে তুলতে হবে ও আরো উন্নতমানের ঔষধ ভারতবর্ষে প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে, তবে শিল্পের ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ্য। সারাভাই কেমিক্যালের এক বার্ষিক সভায় তিনি বলেছিলেন:

'In the pharmaceutical industry, it should be recognised that highest standards of quality should be established and maintained at any cost: Research should be initiated as an impotant function of the industry.' তাঁর এই আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। কারণ পরবর্তিকালে সারাভাই কেমিক্যালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এদেশে ঔষধ তৈরি শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মোট কথা, তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা ভারতের এই শিল্পটিকে নানা

দিক দিয়ে অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত করে এই ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে।

আমাদের দেশে শিল্পগুলিতে সারাভাই একটি ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন। কোন শিল্পেই ল্যাবোরেটরি ছিল না; অথচ ল্যাবোরেটরি ভিন্ন উন্নতমানের উৎপাদন সম্ভব নয়। এইক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রয়াস ছিল আমেদাবাদ বস্ত্র শিল্প রিসার্চ এসোসিয়েশন। শিল্প যদি গতানুগতিক পথে চলে, তাহলে তার উৎপাদনও হবে গতানুগতিক ধারায়। শিল্পে সাধারণ শ্রমিকের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে সুশিক্ষিত ও টেনিং প্রাপ্ত গবেষক কর্মীর। আমেদাবাদ বস্ত্র শিল্পে সারাভাইয়ের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় আছে তাঁর সংগঠিত 'ATIRA' বা আমেদাবাদ টেক্সটাইল ইনডাস্ট্রিজ রিসার্চ এসোসিয়েশন নাম সংস্থাটির মধ্যে। সেই প্রথম এদেশের বস্ত্রশিল্পে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং এই দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য শিল্পেও অনুসৃত হয়।

১৯৬২ সালে শিল্পনগরী আমেদাবাদে আর একটি নতুন ধরনের সংস্থা গড়ে উঠেছিল—ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্ট। এর পিছনেও একটি মানুষের মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল। তিনি বিক্রম সারাভাই। ব্যবস্থাপনা বা management যে একটি শিক্ষনীয় বিষয় এবং যে কোন শিল্পের পক্ষে উন্নত ধরনের ব্যবস্থাপনা যে প্রয়োজন এটা পূর্বে শিল্পপতিদের জানা ছিল না। আমাদাবাদে যেদিন 'IIM' বা ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্টের উদ্বোধন হয় সেদিন সারাভাই তাঁর ভাষণে বলেছিলেন: 'I feel that the rapid growth of India to an industrial power will demand management skills of high order.' তাঁর এই উক্তির সারবত্তা ভারতের প্রত্যেক শিল্পপতি এখন স্বীকার করেন—স্বীকার করেন যে ব্যবস্থাপনা নৈপুণ্য ভিন্ন কোন শিল্পেরই উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই জাতীয় সংস্থার মধ্যে বর্তমানে

এটিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ। এইভাবে শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে তিনি যে বিপ্লব এনে দিয়েছেন শুধু সেইজন্যই ভারতবাসী এই বিজ্ঞানীর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

স্বনামধন্য ফরাসী বিজ্ঞানী পিরী কুরী বলেছিলেন: 'To make life a dream and to turn the dream into a reality is the object of life.' আমাদের কালে দেখলাম হোমি ভাবা ও বিক্রম সারাভাই—এই দুই বিজ্ঞানীর জীবনের যেমন স্বপ্ন ছিল, তেমনি তাঁরা তাঁদের স্বপ্নকে চরিতার্থ করে গেছেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে। অনেক বিষয়েই এঁদের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; তাঁরা দুজনেই খুবই অল্প বয়সে মারা গেছেন—ভাবা ৫৬ বছর বয়সে আর সারাভাই ৫২ বছর বয়সে। যদিও তাঁদের জীবনের প্রথমভাগে তাঁর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরা দুজনেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। হোমি ভাবা ভারতকে স্থাপন করলেন পারমাণবিক মানচিত্রে আর সারাভাই দেশকে স্থাপন করলেন মহাকাশ মানচিত্রে। সারাভাই-এর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: I realise that the space age is a new ages for mankind.' এই নতুন যুগেই এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানী আমাদের দেশকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছেন। ভারতীয় উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' এরই উজ্জ্বল নিদর্শন।

সারাভাই-এর জীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক সাধনা দেশ-বিদেশের প্রদত্ত বহু দুর্লভ খ্যাতি দ্বারা চিহ্নিত ছিল। ১৯৭১, ৩০শে ডিসেম্বর এই বিশ্রুতকীর্তি বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন।
